দ্বীপ

নবেন্দু ঘোষ



প্রকাশক :
শ্রীসরোজনাথ সরকার এম্. এ., বি. এল
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য : দুই টাকা মাত্র

১৩৩৮

মুদ্রাকর :
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি. এল্. রায়, ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

সুকান্ত হালদারের করকমলে—

এই লেখকের লেখা

উপন্যাস

ডাক দিয়ে যাই

নায়ক ও লেখক

ফিয়ার্স লেন

ডাক দিয়ে যাই

বসন্ত-বাহার

প্রান্তরের গান

কাঞ্চনপুরের ছেলে

কালো রক্ত (১ম খণ্ড)

পৃথিবী সবার

ছোটগল্প

এই সীমান্তে

মানুষ

ইস্পাত

কান্না

দ্বীপ

ছেলেটি চোখ মেল্‌ল।

তার বয়স বেশী নয়, খুব বেশী হ'লে তেইশ কিংবা চব্বিশ। শ্যামবর্ণ আকৃতি, লম্বা দোহারা গড়ন, জ্বল্‌জ্বলে ও ভাষাময় দুটি চোখ আর মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। কিন্তু চেহারাটাই তার সব কিছু নয়, অদ্ভুত একটা মার্জ্জিত রুচির ছাপ যেন তার সর্বাঙ্গে লাবণ্যের মত জড়িয়ে আছে।

ছেলেটি চোখ মেল্‌ল। ভোরের রাঙা আলো এসে তার চোখে পড়ল, জোলো হাওয়ায় তার শরীর মৃদু শীতবোধে একটু কেঁপে উঠল। নিজের দিকে তাকিয়ে সে দেখল যে তার ধুতি ও গেঞ্জী, তার সর্বদেহ সিক্ত। জলে তার হাত-পা

আর গায়ের চামড়া নরম হয়ে কুঁচকে উঠেছে। সে বুঝতে পারল যে সে জলে ভিজেছে। কিন্তু কোথায়? কি-ভাবে?

নরম ও ঝক্‌ঝকে বিস্তীর্ণ বালুতটের ওপর সে শুয়ে ছিল, এবার উঠে বসল। পায়ের কাছে উত্তাল জলরাশি এসে ভেঙে পড়ছিল, আবার ফেনপুঞ্জ ফেলে পশ্চাদ্‌পসরণ করছিল। ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, চারিদিকে তার বিস্ময়-ভরা চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল, কিন্তু চোখের বিস্ময় তার ক্রমেই রূপান্তরিত হল। এ কোথায় সে! তার সাম্‌নে, ডাইনে, বাঁয়ে শুধু জল আর জল। অগাধ, অশান্ত, দিগন্তপ্রসারী জলরাশি সর্বত্র তরঙ্গায়িত বিপুল আবেগে শুধু খলখল করে হাস্‌ছে, কুটিল স্রোত ঘূর্ণাবর্তের আকারে তার প্রাণশক্তি গম্ভীর নির্ঘোষে সব কিছু ভেঙে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। কী বিচিত্র জলের রং! সামনের দিকটায় জলের রং সাদা ও ঘোলাটে, কিন্তু বামে ও দক্ষিণে তা দূরে কৃষ্ণবর্ণ এবং অতি দূরে মসীকৃষ্ণ। আর কী বিপুল তার তরঙ্গগুলো! একটার পর একটা অগণন, অনন্ত তরঙ্গরাশি অবিরাম গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। সগর্জনে। উন্মত্ত জলহস্তীর মত।

দিকচক্রবালের কোথাও কি তটভূমির শ্যামরেখা দেখা যাচ্ছে? ছেলেটি তাকাল। দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণতর করতে গিয়ে তার চোখে জ্বালা করে শুধু জলই এল এবং সেই লবণাক্ত অশ্রুর ভেতর দিয়ে সে উপলব্ধি করল যে অসীম জলরাশি ব্যতীত আর কিছুই তার নজরে পড়ছে না। কিছু

না। তার ডাইনে বাঁয়ে আর সামনে শুধু জল আর জল, অনন্ত জলরাশি আর অসীম আকাশ যেন দিগন্তে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

কিন্তু তার পেছনে? ছেলেটি ঘুরে দাঁড়াল, আশ্বস্ত হল। তার পেছন দিকে বালুতট গিয়ে মৃত্তিকাভূমিতে মিশেছে। শ্বেত চন্দনের মত রং সেই মাটির, ভারী নরম তার স্পর্শ। বালুতট থেকে উঁচু হয়ে তা কিছুদূরে গিয়ে একটা প্রস্তর-মিশ্রিত টিলায় পরিণত হয়েছে। সেখানে নিবিড় সবুজের স্নিগ্ধ প্রশান্তি; নারিকেল, সুপারী, ঝাউ, সুন্দরী গাছ ও নানা আগাছার জঙ্গল। না, হতাশ হবার কিছু নেই। হয়ত টিলার ওপারে, তটভূমি বিস্তৃত হতে হতে লোকালয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। দেখাই যাক্ না।

পা বাড়াতে গিয়ে ছেলেটি থামল। একটা অন্তর্দাহী তৃষ্ণায় বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। জলের মধ্যে নেমে সে অঞ্জলি ভরে জল তুলে মুখে দিল কিন্তু পরমুহূর্তেই তা বিকৃত মুখে থু থু করে ফেলে দিল। জলের স্বাদ ঘোর লবণাক্ত।

মুহূর্তকাল স্থির হয়ে রইল সে, তারপর কি ভাবল। ভাবতেই যেন একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ তার সারা দেহে খেলে গেল। জলের রং আর স্বাদের অর্থ যেন সে হঠাৎ বুঝতে পারল। বুঝতে পেরে তার চোখে ত্রাস ঘনাল, ঘুরে দাঁড়িয়ে সে সবেগে টিলাটার দিকে দৌড়োল।

টিলাটা প্রায় পঞ্চাশ গজ উঁচু। সেখানে উঠে সে সামনের

দিকে তাকাল। কিন্তু ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালা আর লতাগুল্মের দুর্ভেদ্যতা ভেদ করে বেশীদূর নজর গেল না তার। মরিয়া হয়ে সে এগোল। পদে পদে গাছের বাধা, আগাছার প্রতিবাদ। সব কিছু ঠেলে, এড়িয়ে, পদদলিত করে সে কিছুক্ষণ পর একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পৌঁছোল। এবার সব কিছু দেখা যাচ্ছে। আশায়, উৎসাহে বুকটা দুলে উঠল তার, কিন্তু সামনের দিকে তাকাতেই প্রস্তরবৎ নিশ্চল হয়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে মাটির ওপর বসে পড়ল।

টিলার ওপর থেকে দিগন্ত পর্যন্ত সব কিছু দেখা গেল। ধীরে ধীরে টিলাটা সামনের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। কিছুদূর গিয়ে একটা ছোট্ট ঝিল, তারপর আরো নীচে নেমে গেছে তা, নামতে নামতে বহুদূরে একটা জলাশয় অতিক্রম করে, একটা অতিকায় কুমীরের লেজের মত প্রস্থে ছোট হতে হতে শেষে বোধ হয় জলে ডুবে গেছে। তার দু'পাশে অন্তহীন জলরাশি, তারপরও শুধু জল আর জল বলে মনে হচ্ছে। টিলাতে ওঠায় মনের মধ্যে যে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠেছিল তা এবার একমুহূর্তে নিভে গেল: অন্ধকার। লঘুপক্ষ মেঘাবৃত আকাশের সূর্য যেন মুহূর্তে রাহুগ্রস্থ হল। চোখের সামনে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। কানের মধ্যে নিজের হৃদ্‌পিণ্ডের ধ্বনি, বাতাসের শব্দ, চারিদিকের জলকল্লোল আর নারিকেল সুপারিবনের মর্মরধ্বনি। চেতনা যেন মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, তবু তার ক্ষুৎপিপাসাকাতর দেহের অন্তরালে

বসে শঙ্কিত, ভয়ার্ত মনটা প্রশ্ন করল—কে? কোত্থেকে এলাম এই দ্বীপে? আমি কে?

"আমি কে?" নিজের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল ছেলেটির কানে। এই অস্বস্তিকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজের ক্ষীণ কণ্ঠও যেন আশ্বাস বয়ে আনল তার কাছে।

ভাবতে চেষ্টা করল সে। বার বার। কে সে? কোথায় থাকত সে? কি করে সে এখানে এল? নিজের ভিজে জামা কাপড় আর শরীরের দিকে নজর পড়ল তার। বোধ হয় জলে ভেসে এসেছে সে কিংবা কেউ হয়ত তাকে বালুতটের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে। কিন্তু কে ফেলে দিয়ে গেছে? সে কে?

বারংবার ভাবতে চেষ্টা করল সে। সমস্ত শরীরকে টান টান করে, সমস্ত শিরা-উপশিরাকে সজাগ করে, মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে সে নিজের অতীতকে বারংবার খুঁজল কিন্তু কোন কিছুই বুঝতে পারল না, খুঁজে পেল না। জলের ভেতর থেকে একটা গুরুভার বস্তু টেনে তুলতে গিয়ে অপারগ হয়ে সে যেন নিজেই ডুবে যেতে লাগল। না, সে জানে না সে কে।

অবসন্ন চেতনা নিয়ে সে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার তার জীবন-যন্ত্র চালু হল, আবার তার শক্তি ফিরে এল। সে চারিদিকে তাকাল। দ্বীপটাকে শঙ্খের মত দেখাচ্ছে। যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে দ্বীপটাকে খুব বড় বলে মনে হচ্ছে না। আর তা নিবিড় জঙ্গলে ভরা। মাঝে

মাঝে অবশ্য খোলা জায়গাও আছে কিন্তু এখান থেকে সব কিছু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না ; আমি কে ?

ছেলেটি এগোল। দেখা যাক্ না কি আছে দ্বীপটাতে। হয়ত তেমন ভয়ের কিছু নেই, হয়ত মানুষজন আছে এখানে। আর মানুষ থাকলে এখান থেকে অন্যত্র যাওয়া কষ্টকর হবে না। কিন্তু কোথায় যাবো আমি ? আমি কে ?

ভয়ানক তৃষ্ণা।···

বড় বড় পা ফেলে এগোল।

ভোরের আলোতে তখনো রং আছে। দক্ষিণ থেকে হু হু করে বাতাস বইছে। আকাশের বুকে প্রসারিত-পক্ষ সমুদ্র-চিলদের দেখা গেল ; শিশু আর হেন্তাল গাছের ডালে দেখা গেল নীলকণ্ঠ পাখীদের। শোনা গেল ঘুঘুর ডাক। শুকনো পাতা বিছানো মাটির ওপর খচ্‌মচ্‌ করে এগোতে এগোতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ছেলেটি। পাঁচ ছ'হাত দূরে একটা দুধরাজ সাপ মাথা দোলাচ্ছে। পেছিয়ে গিয়ে নিরাপদ জয়গায় দাঁড়াল সে ; সাপটা চলে গেল।

কিন্তু কে ? মানুষের তো কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না !

বড় তৃষ্ণা। আমি কে ?

মাঝে মাঝে বুনো ফুলগাছের ঝোপ পাওয়া গেল। সেখানকার বাতাসে উগ্র সুবাস। স্থলপদ্মের গাছও মাঝ মাঝে দেখা গেল। চলতে চলতে ছেলেটি মনে মনে বিচার করে বুঝতে পারল যে সে দক্ষিণে যাচ্ছে ! কি যেন একটা শব্দ ! আবার

কি কোন সাপ। ছেলেটি কাঠ হয়ে দাঁড়াল, এদিক ওদিক সন্তর্পণে তাকাল। হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে গেল সে। একটা চিত্র-হরিণ। নিষ্পলকনেত্রে কয়েকমুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে হরিণটা এক লাফ দিল। পর মুহূর্তেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পলায়ন-পথের দিকে তাকাতে গিয়ে ছেলেটি দেখল যে জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রাচীরের বহু-পুরাতন ভগ্নাবশেষ। তার পাশে বিরাট একটা অট্টালিকার চিহ্ন।

ছেলেটির মনে বল এল। হয়ত কাছাকাছি কোথাও মানুষ আছে। সে এগোল। কিন্তু কোথায়? শুধু ছোটবড় অনেকগুলো ভগ্নস্তূপ, একটা ভগ্নমন্দির, আর কিছু নয়। জীবন্ত মানুষের বাসযোগ্য বাড়ী বা পর্ণকুটীর তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তাহলে?

হঠাৎ চীৎকার করে উঠল সে, "কে আছো-ও-ও-ও শোন-ও-ও-ও-"

গাছে গাছে প্রতিহত হয়ে তার চীৎকারের ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল, নারকেল সুপারীর মর্মরধ্বনিতে মিশে গেল, কিন্তু কোন সাড়া এল না।

আরো জোরে চেঁচাল সে, "এদিকে কে আছো ভাই-ই-ই-শোনো-ও-ও-ও-ও— "

না। কোন সাড়া দিল না কেউ। শুধু গাছের ডালে বসা টিয়া ঘুঘু আর নানা অচেনা পাখীরা সচকিত হয়ে কোলাহল তুলে উড়ে পালাল, দূরবর্তী গাছে গিয়ে বসল। তারপর

আবার সব চুপ্। শুধু বাতাসের আওয়াজ, জলকল্লোলের শব্দ আর মর্মরধ্বনি।

পিপাসায় বুক জ্বলে যাচ্ছে। আমি কে?

কেউ সাড়া দিল না। ছেলেটি পাগলের মত এগোল সামনের দিকে। কিন্তু মানুষের ছায়া কোথাও পেল না সে। শুধু মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ইটের পাঁজা আর মাটির ঢিপি দেখে সে বুঝতে পারল যে মানুষের সাড়া না পাওয়া গেলেও দ্বীপের এই অংশে এককালে বসতি ছিল। আজকাল হয়ত দ্বীপের অপরাংশে মানুষ থাকে। আচ্ছা, দেখা যাক। আর কিছুদূর এগোতে সেই ঝিলের ধারে গিয়ে পৌঁছোল ছেলেটি। ঝিলের রূপ দেখে তার শরীর জুড়িয়ে গেল। টলমল করছে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলরাশি, তার ওপর ফুল ফুটে রয়েছে, জলের ধারে কলমীলতার ঘন বসতি। সূর্যালোকিত জলের ওপর বাতাস মৃদু তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। আশ্চর্য একটি প্রশান্ত পরিবেশ।

জল!

ছেলেটি ছুটে গেল, উন্মত্ত আগ্রহে সে দুই হাতে অঞ্জলি ভরে জল তুলে নিয়ে মুখে দিল। অদ্ভুত সেই জলের স্পর্শ। ঠাণ্ডা। অদ্ভুত সেই জলের স্বাদ। মিষ্টি। শুকনো জিভকে সরস করে তা কণ্ঠদেশ বেয়ে দেহের ভেতরে একটা সুনিবিড়, স্নিগ্ধ অনুভূতিকে ছড়িয়ে ছিল। তার ধমনীর স্পন্দন সহজ হল, চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হল, মনের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাল যে জলের মত মানুষকেও খুঁজে পাবে সে। আমি কে?

আবার এগোল ছেলেটি।

সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। নারিকেল, সুপারী, সুন্দরী, শিশু আর গাবগাছের জঙ্গল। এখানে ওখানে একআধটা অশ্বত্থ আর বটগাছের রাজকীয় আত্ম-ঘোষণা। একটা দুটো আম আর গর্জণগাছ। ছোট ছোট বাঁশঝোপ। বুনো ফুলের ভীড়। ঝিলের ধারে হোগলার বন। ভাঙ্গা ধ্বসে-যাওয়া বাড়ীর চিহ্ন। সাপ আর শেয়াল। কিন্তু মানুষ—মানুষ কোথায়?

"এখানে কি কেউ আছো-ও-ও-ও?"

কেউ সাড়া দিল না।

আরো এগোল সে। দক্ষিণ দিক থেকে একটা একটানা গর্জনধ্বনি ভেসে আসতে লাগল।

একটু একটু করে ওপরে উঠল সূর্য। বেলা বাড়তে লাগল।

দ্বীপটা প্রস্থে ছোট হয়ে এল।

ছেলেটি দেখল যে যেটিকে তার দূর থেকে জলাশয় বলে মনে হয়েছিল তা আর কিছুই নয়, চারদিকের জলরাশির একটা খালের মত ধারা এসে দ্বীপের ভেতরে প্রবেশ করেছে, একটা খাড়ির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তার জলের রং নীলাভ। তা দেখে সে আবার ভয় পেল, আবার তার চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। তবু এগোল সে। এগোতেই তার কানে সেই পূর্বশ্রুত জলগর্জনের শব্দ এবার সুস্পষ্ট ও নিকটবর্তী বলে মনে হল। একটানা, মহাগম্ভীর। ভয়কে যাচাই করার জন্য ছেলেটি

দৌড়োল, গাছপালার ঘন যবনিকা ভেদ করে সে দ্বীপের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দাঁড়াল, টলতে টলতে সামনের দিকে তাকাল। তার পায়ের কাছ থেকে হঠাৎ খুব ঢালু হয়ে মাটির রেখা গিয়ে বালুতটে মিশেছে। আর তার পরে স্থলভূমি নয়, নিরাপত্তা নয়। তারপরেই দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত কৃষ্ণবর্ণ জলরাশি। তরংগ-সংকুল, মৃত্যুমন্ত্রঘোষণাকারী, আদিম কুটিলতা। আর কী গম্ভীর তার গর্জন! যেন তা গতিশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাদধ্বনি, যেন তা ব্রহ্মাণ্ডময় পরিব্যাপ্ত মহাশক্তির তরল ও ধ্বনিময় রূপ। সমুদ্র। এবার আর মোহনার ঘোলা জলের আশ্বাস নয়, এবার তার সুনিশ্চিত রূপ। এবার আর মাটির বরাভয় নেই, এবার নিষ্ঠুর হিংস্রতার উল্লাস। সমুদ্র।

আমি কে?

আর একবার মরিয়া হয়ে ভাবতে লাগল ছেলেটি। কি করে আমি এই দ্বীপে এলাম? আমার কে আছে? কোথায় ছিলাম আমি? কিন্তু না, অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল সে। তার কিছুই মনে পড়ছে না। শুধু এইটুকুই সে বুঝতে পারছে যে একটা নির্জন দ্বীপে সে ভেসে এসেছে। সে একা। তার পায়ের নীচে মাইল কয়েক লম্বা আর মাইল খানেক চওড়া একটা ছোট্ট দ্বীপ, আর সেই দ্বীপের চারিদিকে শুধু দিক্-চিহ্নহীন কুটিল জলরাশি।

সামনের দিকে তাকাল ছেলেটি। আকাশের গায়ে মিশে গেছে সমুদ্র। বায়ুবেগে মস্ত বড় বড় ঢেউ ফেনার মুকুট

পরে সবেগে দ্বীপের দিকে গড়িয়ে আসছে। দেখে ভয় হল, বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল, দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে সে তীর-ভূমির ওপর নিবদ্ধ করল।

একটু বাঁদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতেই সে প্রায় অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠল। মুহূর্তকাল স্থির হয়ে সে নিজের ইন্দ্রিয়কে পরখ করে নিল, তারপর দ্রুতপদে নীচের দিকে নেমে গেল। তীরভূমির বালুরাশির ওপর একটি মানুষ পড়ে আছে।

কম্পিতবক্ষে কাছে গেল সে।

আর একবার বিস্মিত হল ছেলেটি। বালুতটের ওপর যে পড়ে আছে সে পুরুষ নয়, নারী। তার সর্বাঙ্গ সিক্ত, দু' চক্ষু মুদ্রিত।

"শুনুন"—ছেলেটি ডাকল।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ছেলেটি আরো জোরে ডাকল, "শুনুন"—

এবারেও কোন সাড়া দিল না মেয়েটি। নড়লও না। তার মধ্যে প্রাণের কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

ছেলেটির মনে ক্ষীণ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। হোক্ নারী, তবু মানুষ তো। কিন্তু তার সেই উৎসাহ এবার নিভে এল। মেয়েটি কি মৃতা?

একটু ইতঃস্ততঃ করে সে মেয়েটির একটি হাত তুলে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করল। না, আশা আছে—মেয়েটি

বেঁচে আছে। হয়ত পেটে অনেকখানি জল গেছে কিংবা ভয়ে ও ক্লান্তিতে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে সে।

ছেলেটির মনে পড়ল যে কি করা উচিত এক্ষেত্রে। মেয়েটিকে উপুড় করে ফেলে তার পিঠে চাপ দিতে লাগল সে। আরো কয়েকটা প্রক্রিয়ার কথা মনে পড়ল তার, সেগুলোরও প্রয়োগ করল সে।

কয়েক মিনিট কাটল।

মেয়েটির কস্ দিয়ে বেশ খানিকটা জল গড়াল। আরো কয়েক মিনিট।

হঠাৎ মেয়েটি চোখ মেল্‌ল। তার দৃষ্টিতে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। যেন সে চোখ মেলে স্বপ্ন দেখছে।

"শুনুন"—

মেয়েটি এবার আরো চোখ মেল্‌ল। শুধু জ্ঞান নয়, বুদ্ধিও ফিরে আস্‌ছে তার। ছেলেটির ডাক তার কানে গেল, সে তাকাল।

ছেলেটি প্রশ্ন করল, "কেমন লাগছে এখন? খুব কষ্ট হচ্ছে কি?"

মেয়েটি অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। যেন ভাবতে চেষ্টা করল—ব্যাপার কি?

তার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, তার ক্ষীণ কণ্ঠ ধ্বনিত হল। সে প্রশ্ন করল, "আমি কোথায়?"

ছেলেটি বিষণ্ণ হেসে বলল, "একটা দ্বীপে"—

"দ্বীপ !" মেয়েটি উচ্চারণ করল।

"হ্যাঁ"—

"ওঃ—ওঃ।" মেয়েটি যেন ছেলেটির কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য চারিদিকে তাকাল। এখনো যেন তার দু'-চোখে স্বপ্নের ঘোর লেগে রয়েছে। ঐ ছেলেটি, এই দ্বীপটি, সামনের ঐ অনন্ত নীল সমুদ্র আর আকাশ সব যেন একটা বিচিত্র স্বপ্নের অংশ।

ছেলেটি এইবার মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকাল, তাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল।

মানুষ—এই তার মুগ্ধতার প্রথম কারণ। নারী—এই দ্বিতীয় কারণ! সুন্দরী নারী—এই সর্বশেষ কারণ।

হ্যাঁ, মেয়েটি সুন্দরী। নাক চোখ মুখের গড়ন আর দেহবর্ণ দিয়ে সৌন্দর্য নিরূপিত হয় তা নয়, তা ছাড়া আরো কিছু। শ্যামাঙ্গী মেয়ে কিন্তু আশ্চর্য তার দেহলাবণ্য, বিস্ময়কর তার উৎফুল্ল যৌবনশ্রী। আর বয়স? বেশী নয়। সতেরো কিংবা আঠারো। পরণের তাঁতের শাড়ী আর হাতের ও গলার গয়না দেখে মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে বলে মনে হল ছেলেটির।

মেয়েটি ধীরে ধীরে মুখ ফেরাল।

ছেলেটি বলল, "আপনি কে? কোথায় যাচ্ছিলেন? কি ভাবে জলে পড়ে গিয়েছিলেন?"

মেয়েটি ছেলেটির দিকে তাকাল।

"জানেন, আমিও আপনার মত দ্বীপে ভেসে এসেছি"—

মেয়েটি টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

"নির্জন দ্বীপ—আমি আর আপনি ছাড়া একটিও জনপ্রাণী নেই এখানে আর"—

হঠাৎ ছেলেটি থেমে গেল। মেয়েটির ভুরু কুঞ্চিত, চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে, নাকটা ফুলে উঠেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে। আর দু'চোখের তারাতে জ্বলছে ঘৃণার আগুন।

বিস্মিতকণ্ঠে ছেলেটি প্রশ্ন করল, "কি হল আপনার? আমায় দেখে ভয় পাচ্ছেন নাকি?"

সেই গভীর ঘৃণাভরা দৃষ্টি মেলে মেয়েটি একইভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে, তারপরে হঠাৎ ক্ষীণ অথচ তিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আপনি বিধর্মী?"

ছেলেটি মাথা নাড়ল, "এ্যাঁ? হ্যাঁ—আমি"...

মেয়েটির চোখ আরো জ্বলে উঠল। মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল সে, টলতে টলতে ওপরের দিকে উঠতে লাগল।

"শুনুন—মানে"—

মেয়েটি ফিরেও তাকাল না।

"বাঃ—শুনুন"—ছেলেটি তার অনুসরণ করল।

মেয়েটি চলার বেগ বাড়াল।

ছেলেটি ভাবতে লাগল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে মেয়েটির প্রশ্নের উত্তরে বলেছে যে সে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। কিন্তু মেয়েটির চোখে ঘৃণা কেন? কেন তার এই বেয়াড়া আচরণ?

ছেলেটি এইবার মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকাল, তাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। আমি কে! ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। আমার উপাসনা-পদ্ধতি পৃথক। ঘৃণা। মস্তিষ্কের ভেতরে যেন একটা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটল। একটা বিপ্লব। সে বুঝতে পারল। ঠিক চেনা যাচ্ছে। মেয়েটি তার ধর্ম মানে না। তার হাতে কাঁচের চুড়ী, কর্ণাভরণ, আর চোখের ঘৃণা তার পরিচয়কে ঘোষণা করে দিয়েছে। কিন্তু আমি কে? সাকারবাদী নিরাকারবাদী—ঘৃণা—। হিন্দু না মুসলমান? আর একটা আগ্নেগিরির বিস্ফোরণ ঘটল। আর একটা বিপ্লব। মাথাটা যেন হাল্‌কা হয়ে গেল, চোখের সামনে থেকে যেন একটা অদৃশ্য যবনিকা সরে গেল। তার মনে পড়ল। নাম, ধাম, পিতৃ-পরিচয় সব মনে পড়ল তার। চোখের সামনে, সমুদ্রের জল আর আকাশের পটভূমি জুড়ে যেন অসংখ্য ছবি এসে ভীড় করল। স্নেহ, মায়া, মমতা আর ভালবাসা নিয়ে যারা তার জীবনে এসেছিল তাদের মুখ যেন সে স্পষ্ট দেখতে পেল। তারপরেই হঠাৎ সেই সব ছবি মিলিয়ে গেল। আরো মনে পড়ল। রাতের অন্ধকার, মশালের আলো, মৃতের মুখ আর রক্তের স্রোত। সব মিলে একটা ভয়াবহ কাহিনী।

ছেলেটি থামল, তার চোখেও ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, "মেয়েটি আমার শত্রু।"—

মেয়েটি ফিরেও তাকাল না, অতিকষ্টে সামনের দিকে এগিয়ে সে সুন্দরী বনের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছেলেটি গভীর ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে বলল, "যাক্‌গে, মরুকগে, একটা বিষাক্ত সাপ যেন ওকে কামড়ায়"—

একটা গাছের তলায় সে বসে পড়ল। মাথা তার গরম হয়ে উঠেছে, শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। ঐ মেয়েটির জাতের লোকেরাই তার সবচেয়ে বড় শত্রু। পৃথিবীতে যদি ওরা না থাকত তাহলে সে আর এই নির্জন দ্বীপে বসে নিজের অতীতকে স্মরণ করত না, ভবিষ্যৎকে অন্ধকার দেখত না। এই তো গতকাল—

গতকাল এই সময়ে সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে তাদের বাড়ীর সবাইকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে। তিন দিন আগে থেকেই গ্রামে দাঙ্গা সুরু হয়েছিল বটে কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার মত মারাত্মক ঘটনা তখনো ঘটেনি। ভাগিরথীর মোহানায় তাদের গোপালপুর গ্রাম, গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই ছিল বিধর্মী। পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার কথা শুনে কলকাতা অঞ্চলে দাঙ্গা সুরু হওয়ার কথা দিন কয়েক আগে গোপালপুরে শোনা গেল। হিন্দু এবং মুসলমানদের নাকি নৃশংসভাবে খুন করা হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায়। গোপালপুরের হিন্দু মুসলমানেরা ক্ষেপে উঠল। তারপরে হঠাৎ একদিন দাঙ্গা সুরু হয়ে গেল—এই তিন দিন আগে। মোবারক আলির গরু ননী দাসের সব্জীর বাগানে ঢুকে সব তছ্‌নছ করায় ননী গরুকে বেধে রাখল বাড়ীতে। ঝগড়া, মারামারি। দু'শো সংখ্যাগুরু জড়ো হয়ে একজন সংখ্যালঘুর বাড়ী লুট করল, আগুনে পুড়িয়ে দিল

তা, তাদেরি চোখের সামনে লোকটির বৌকে নিয়ে বেইজ্জৎ করল। তারা বাধা দিতে গিয়ে মা'র খেয়েছিল, দু' একজন মরেও ছিল, পরে সবাই পালিয়েছিল। শুধু তাই নয়। এখানে ওখানে, ঝোপে জঙ্গলে একা চলতে গিয়ে আরো পাঁচজন সংখ্যা-লঘু ছোরা খেল। গ্রামের নিরীহ লোকেরা আতঙ্কে দরজা জানালা বন্ধ করে ঈশ্বরের নাম জপতে সুরু করল। সংখ্যা-গুরুদের মধ্যে দু'একজন সৎ লোক উত্তেজনাকে দমন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তারপর গতকাল। রাত দশটা নাগাদ। তাদের কানে একটা কোলাহলের রেশ ভেসে এল। তিন চারশো লোক চীৎকার করছে। প্রথমে ব্যাপারটা বোঝা গেল না, কিন্তু ক্রমেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। চীৎকার শোনা গেল। ভগবানের নাম করে পাশব উল্লাসকে ঘোষণা করল সবাই। ব্যাপারটা বুঝল তারা। একজন ছুঠে এসে খবরও দিল যে শত্রুরা আশে-পাশের গ্রাম থেকে এসেছে—তিনশো লোক জড়ো হয়ে সংখ্যালঘুদের বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, লুটপাট করছে, পুরুষদের খুন করে মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। শুনে বাড়ীর সবাই কাঁপতে লাগল। বাড়ীতে তখন চৌদ্দ বছরের কুমারী বোন, ছোট ভাই, বুড়ো বাপ মা আর মামা। মুহূর্ত্তে গয়না আর টাকাপয়সা নিয়ে একটা পোঁটলা বেঁধে তারা সব ফেলে রেখে বাড়ী থেকে বেরোল। অন্ধকারে, ঝোপ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সবাই ঘাটের দিকে অগ্রসর হল। রাস্তায় আরো কয়েক জনের সঙ্গে দেখা হল, দল বাড়ালো। ঘাটে তাদের নৌকা আছে,

তাতে চড়ে তারা পাঁচ মাইল দূরবর্তী সংখ্যালঘুপ্রধান গ্রামের দিকে পালাবে এই স্থির হল। কিন্তু আকাশ তখন মেঘে মেঘে অন্ধকার, বাতাস একটুও নেই। ঝড় আসবে বলে মনে হল। অন্ধকার রাতের বেলা, দিকচিহ্নহীন নদীর জলে কালবৈশাখীর রূপ যে কি ভয়ঙ্কর হবে তা অনুমান করেও তারা থামল না। আসুক ঝড়, দাঙ্গার বিভীষিকার চেয়েও তা বড় নয়। ওদিকে গ্রামের ভেতর তখন পৈশাচিক তাণ্ডব চলছে। অন্ধকারের বুকে জ্বলন্ত বাড়ীগুলোকে চিতাগ্নির মত মনে হতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সবাই, নিঃশব্দে কাঁদল, অথৈ জলে নৌকা ভাসাল। তীর ঘেঁষে নৌকা চালানো এখন চলবে না, কারণ কোত্থেকে কে দেখে তাড়া করবে কে জানে? গোপালপুর ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু হঠাৎ বিপদ হল। ঝড় এল। নদী ফুলে উঠল, এক মুহূর্তে রাক্ষসীর মত ভয়ংকর হয়ে উঠল তা। সামাল্ সামাল্ করে তীরের দিকে নৌকো নিয়ে যাবার জন্য হাল ঘোরাতে গিয়েও কিছু হল না। ঝড়ের ঝাপটায় অসহায় তৃণখণ্ডের মত তাদের নৌকো আবার পেছিয়ে চলল। সবেগে। তারা প্রাণের আশা ছেড়ে দিল। ঝড় ক্রমেই বাড়ল, নদীর চেহারা হিংস্রতর হয়ে উঠল, অন্ধকার গাঢ়তর হল। বাতাসের শব্দ, নদীর গর্জন আর মেঘের ডাক—সব মিলে একটা প্রলয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি করল। হাত আর পায়ের পেশীগুলো প্রমত্ত ঝড়ের কাছে পরাজিত হল, নৌকো ফেরানো গেল না।

তীরের কাছেও ঘেঁষা গেল না। দু'তিন মিনিটে এক মাইল পেরিয়ে যেতে লাগল তারা, নৌকো যেন উড়ে চলল। মা, বোন ও অন্যান্য মেয়েরা কাঁদতে লাগল, বাবা মামা আর অন্যান্য বয়স্ক পুরুষেরা ঈশ্বরকে স্মরণ করতে লাগলেন, সে আর ছোট ভাই কাঠ হয়ে বসে রইল। হঠাৎ নিরন্ধ্র অন্ধকারে বিপরীত দিক থেকে একটা স্রোতের ধাক্কা। পাহাড় প্রমাণ তরঙ্গের আঘাত আর বাতাসের ঝাপটা। তারপর বিরাট একটা আর্তনাদের মধ্যে সে দেখল যে তাদের নৌকোটা ক্ষণকালের জন্য স্থির হয়ে থেকে মড় মড় করে ভেঙে গেল, ডুবে গেল।

ছেলেটি নড়ে উঠল, দুহাতে সে মাথাটা চেপে ধরল। মাথাটা যেন যন্ত্রণায় ফেটে যাবে, চোখ দুটো দিয়ে যেন রক্ত বেরিয়ে আসবে; তারপর? মা, বাবা, ভাই, বোন আর মামার কি হল? কি আবার? সলিল-সমাধি। একা, পৃথিবীতে সে এখন একা। কিন্তু কেন বাঁচল সে? কেন? এমনভাবে বেঁচে থাকতেই কি চেয়েছিল সে?

"শত্রু! ওরা—ঐ বিধর্মীরা আমার শত্রু।"

দাঁতে দাঁত ঘষল সে। তার চোখে ঘৃণা আর হিংসার আগুন জ্বলতে লাগল। তার মনে পড়ল। সে এক ইতিহাস। স্বার্থপরতা, দাঙ্গাকারীদের হত্যা, লুণ্ঠন, শোষণ ও নারী-নির্যাতন। ধর্ম ও স্বাধীনতার শত্রু তারা। তাদেরই জন্য দেশ আজ স্বাধীন হয়েও বিভক্ত। তাদেরই জন্য কলকাতা, বিহার,

নোয়াখালি, পাঞ্জাব, ঢাকা, বরিশাল আর চট্টগ্রামের কাহিনী। কত মৃত্যু, কত রক্ত! কত নারীর সতীত্বকে কত পশু অপমান করল! শিশু, বৃদ্ধ কেউই রেহাই পায়নি। পাঞ্জাবে, বাংলায় তারা বীভৎস নরকের প্রতিষ্ঠা করেছে। হিংসা তাদের চিরকালের মূলমন্ত্র।

দাঁতে দাঁত ঘষে আবার ছেলেটি বলল, "শত্রু—ওরা আমার চিরকালের শত্রু।"

উঠে দাঁড়াল সে, তার চোখে মুখে একটা কঠিন শপথ রেখায়িত হল। কিছু যায় আসে না। ওরা যেমন আমাদের সম্মান করেনি, দয়া করেনি—সে তেমনি ঐ মেয়েটিকে দয়া করবে না। হাঁ, সে খুন করবে, সে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করবে।

দ্রুতপদে এগোল সে। লতাজাল ছিঁড়ে, শুক্‌নো পাতা দলে পিষে। একটা আহত শ্বাপদের মত।

কিন্তু কোথায়? মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে না।

তবু এগোল সে। কোথায় যাবে মেয়েটি—এতটুকু দ্বীপের মধ্যে তাকে খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন নয়।

তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল সে।

কিন্তু না, তার শিকারকে তবু সে খুঁজে পাচ্ছে না।

তখন সূর্য প্রায় মাথার উপরে উঠেছে, নির্জন দ্বীপের গাছপালাগুলো সমানে মর্মর গান গেয়ে চলেছে। প্রশান্ত পরিবেশ। তবু কি ভয়ংকর! ছেলেটি থামল। তার পা টন্‌টন্‌ করছে, মাথা ঝিমঝিম করছে, তার হিংসা ঝিমিয়ে

ঝিমিয়ে আসছে। ক্ষুধা। ক্ষুধার জ্বালায় সে আর এগোতে পারছে না। থাক। কোথায় পালাবে মেয়েটা? ঠিক খুঁজে বের করবে সে, তাকে সে খুন করবেই। কে তাকে বাধা দেবে?

ক্ষুধা।

কি খাবে সে? ছেলেটি হাসল। খাদ্যাভাবে মরতে হবে না এই দ্বীপে। অসংখ্য নারকেল আছে, আছে বড় বড় মৌমাছির চাক, আমগাছে কাঁচা আম, ডুমুর, ঝিলের মাছ, হরিণের পাল আর নামহীন বুনো ফল। দ্বীপের দেবতা নিষ্ঠুর নয়। তাছাড়া পৃথিবীর সবাই তো ভাত খায় না।

কি খাবে সে?

ছেলেটি ভাবল। নারকেলই ভালো।

কিন্তু কি করে নারকেল কাটবে সে? নারকেল গাছে চড়তে সে জানে কিন্তু কাটবে কি দিয়ে?

চিন্তার বিষয়। এদিকে খিদের জ্বালায় পেটটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। বহুদিনের একটা সুসুপ্ত সর্পরাজ যেন তন্দ্রাভরে পেটের মধ্যে গর্জন করছে। কি করবে সে?

থাক মেয়েটা; নিজের প্রাণরক্ষা হলেই পরের প্রাণহরণ।

এখানে ওখানে, ইট আর মাটির বাড়ীর ধ্বংসাবশেষগুলোতে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যদি কিছু নজরে পড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ খুঁজল সে।

তারপর একসময়ে তার চোখের তারা খুশীতে ঝকমক

করে উঠল। পেয়েছে সে। বহু পুরাতন একটা মরচে-ধরা লোহার শিক। শিকটা নিয়ে সে ছুটল, বেছে বেছে একটা হেলে-পড়া নারকেল গাছে উঠল। এক কাঁদি নারকেল পেড়ে সে নীচে নামল। সেই শিকের ঘায়ে ছোবড়া ছাড়িয়ে সে দু'তিন মিনিটেই দুটো নারকেল বের করল। তারপর—আঃ—। বেঁচে থাকার ব্যাপারটা কি বিচিত্র! শোক, দুঃখ অনাহার সব তুচ্ছ হয়ে গেল। আঃ। থাক মেয়েটা, প্রতিহিংসা পরে চরিতার্থ হবে। মেয়েমানুষকে ভয় কি?

একটু পরিষ্কার জায়গায় একটা গাছের তলায় সে নারকেল-গুলোকে সাজিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল। একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। চারিদিকে দিক্‌চিহ্নহীন জলরাশি—এখুনি কিছু আর করার নেই। মন খারাপ হচ্ছে, বুকটা পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি হবে ভেবে? যা গেছে তা আর ফিরবে না। জীবনটা এক বিচিত্র অধ্যায়ে এসে থেমেছে, রোমাঞ্চকর একটা পর্ব স্ুরু হল আজ। দেখা যাক না কি হয়। কোথায়, কতদূরে যে মানুষ আছে, লোকালয় আছে তা কে জানে। যা হবার হবে। আপাতত ঘুমোন যাক। পাখীরা ডাকছে, ঝাউ গাছের মর্মর শব্দে যেন ঘুমপাড়ানি গান। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ। সমুদ্রের একটানা গর্জন, আর কোথায় যেন—সেই সমুদ্রের কোন এক নিভৃত তলদেশে যেন তার মা, বাবা, ভাই আর বোন—তারি মত শুয়ে আছে, জিরোচ্ছে, তাকে ডাকছে—ডাকছে—ডাকছে—

অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিল সে।

যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা পড়ে এসেছে। চোখ মেলে কয়েক মুহূর্ত খেয়ালই হল না যে সে একটা অজ্ঞাত নির্জন দ্বীপে শুয়ে আছে। তার মনে হল সে যেন তার গোপাল-পুরের বাড়ীতেই আছে। কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র। তারপরই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

এবার কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারল না ছেলেটি। কিইবা করার আছে? যত দিন না কোন জাহাজ বা নৌকো দেখা যায় ততদিন পর্যন্ত এইখানেই থাকতে হবে তাকে।

"কিন্তু কতদিন?" নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল ছেলেটি।

জবাব পেল না।

কোথায় গেল মেয়েটা? পালালো নাকি?

নিজের মনে হেসে উঠল ছেলেটি। তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

দ্বীপের নবাবিষ্কৃত অংশ দিয়ে সে এগোল। একই ছবি। দুর্ভেদ্য জংগল, সাপ, শেয়াল, পাখী আর হরিণ। না, মেয়েটিকে দেখতে পেল না সে। কি ব্যাপার? মেয়েটা আত্মহত্যা করল নাকি? তা'লে কিন্তু আপশোষ থেকে যাবে তার। না, তা নয়। হয়ত মেয়েটাও কাছাকাছি আছে কোথাও, তাকে দেখেই লুকিয়ে পড়েছে। আচ্ছা থাক, কোথায় পালাবে? আজ না হয় তো কাল।

আরো কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল ছেলেটি।

একটা নাল রংয়ের পাখীকে হলদে রংয়ের একরকম বুনো ফল খেতে দেখে সে থামল। পাখীটা উড়ে গেল। একটা ফল পেড়ে সে চেখে দেখল। স্বাদটা অম্লমধুর। খাওয়া চলবে। কয়েকটা ফল পেড়ে নিল সে।

একটা ফাঁকা জায়গায় কিছুটা জল জমে ছিল। তার মধ্যে বড় বড় ঘাস। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে গেল ছেলেটি। ঘাসের সঙ্গে গা মিশিয়ে ধানের চারাও আছে সেই জলের মধ্যে! ধান! তাহলে ঐ সব বাড়ী-ঘরের ধ্বংসাবশেষ বহু পুরাতন নয়। হয়ত মাত্র কয়েকবছর হল এই দ্বীপটা জনহীন হয়েছে। ছেলেটি ভাবে। কি হয়েছিল? এই দ্বীপ কি করে জনহীন হল!

অন্ধকার হয়ে আসছে; ছেলেটি ফিরল। আর এগোন উচিত নয়। ওদিকে জঙ্গল গভীরতর। কৃষ্ণপক্ষ চলছে, রাতের বেলা ওখানে যে কি অন্ধকার হবে তা কল্পনা করে শিউরে উঠল সে। না, খোলা জায়গাতেই থাকবে সে। দ্বীপের শেষপ্রান্তে।

আগের সেই গাছতলাতে ফিরে গেল সে। সেখানে বসে সূর্যাস্ত দেখল। লাল রংয়ের একটা মস্ত বড় বলের মত হয়ে সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিল সূর্য। আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আর সমুদ্রের নীল-কালো জল কিছুক্ষণের জন্য লাল হয়ে উঠল। সমুদ্র-চিলেরা সশব্দে আকাশ বেয়ে উড়ে গেল। তারপর একসময়ে গোধূলির আলোও অন্তর্হিত হল; অন্ধকার

এল, রাত হল। সমুদ্রের একটানা গর্জনের মত বাতাস একটানা বইতে লাগল। আর দূরে, ঝিলের ওদিক থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে এল। ছেলেটির গা ছমছম করে উঠল।

ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হল। আকাশ জুড়ে অগণন নক্ষত্র ঝিকমিক করতে লাগল। সাম্‌নে তরল কালো মৃত্যুর মত সমুদ্র। অন্ধকারেও একটা অস্পষ্ট আলোতে তা সমাবৃত। সেই আলোর রেশ এখানেও একটু এসে পৌঁচেছে। তারি সহায়তায় ছেলেটি তার নৈশ-আহার-পর্ব শেষ করল। নারকেল আর সেই বুনো ফল। তারপর গাছের ওপর উঠে বসল সে, কোঁচা পাকিয়ে ডালের সঙ্গে নিজেকে দৃঢ়ভাবে বাঁধল। এই ভালো। রাতের অন্ধকারে দ্বীপবাসী জন্তু জানোয়ারেরা যে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে তা কে জানে?

রাত বাড়ল।

ছেলেটি ভারতে লাগল। স্বপ্নেও কি সে ভেবেছিল যে এমনি ভাবে তাকে কোনদিন রাত কাটাতে হবে? সবই তো ছিল তার—অথচ!—মা, বাবা, ভাই, বোন। তারা কি কেউ বেঁচে নেই? ঠিক তার মত? অন্য কোন দ্বীপে? না, বিশ্বাস হয় না। তা ছাড়া বেঁচে থাকলেই বা কি করবে সে? এই দ্বীপ থেকে সে বেরোবে কি করে? তার মনে পড়ল। মায়ের মুখ, বাবার মুখ—বিধর্মীরা তার শত্রু। সেই মেয়েটা এখন কি করছে?

আবার শেয়ালেরা ডেকে উঠল।

ওদিকে সমুদ্র একইভাবে গর্জাচ্ছে, বাতাস বইছে, নারিকেল সুপারী আর ঝাউবন মর্মরিত হচ্ছে। অন্ধকার আকাশের বুকে নক্ষত্রেরা সমানে জ্বলছে, কাঁপছে। দূরে, সমুদ্রের গভীরতর অংশে, বড় বড় ঢেউগুলোর মাথায় বাড়বানল জ্বলছে। দ্বীপের বুকে নিশাচর জন্তুদের চলাচল আরম্ভ হয়েছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে।

"বাবা—"

কে! ছেলেটি চমকে উঠল। তার বাবার ডাক বলে মনে হচ্ছে।

"বাবা গো-ও-ও-ও—"

মায়ের ডাক

"দাদা—"

ভাই!

"অ' দাদা—দাদা গো-ও-ও-ও—"

বোন!

অন্ধকারে তাদের মুখগুলো ভাসছে। তাদের মুখের ওপর যেন একটা স্বচ্ছ যবনিকা দুলছে। স্থির নিষ্কম্প তাদের মর্মভেদী দৃষ্টি। আরো মুখ তাদের আশেপাশে। ওরা কারা? যারা এককালে এই দ্বীপের অধিবাসী ছিল তারা?

অন্ধকারে বাতাস বইছে। দ্বীপের চারদিকে জলগর্জন, যেন একটা অখণ্ড শব্দবৃত্তের মাঝে দ্বীপটা। বাতাসে তার নারিকেল-বীথি, সুপারী, সুন্দরী আর ঝাউবনে অবিরাম মর্মর

শব্দ হচ্ছে। কারা থাকত এই দ্বীপে? তারা তাদের পেশল দেহ দিয়ে এখানে জীবনকে কেন স্থায়ী করতে পারল না? কিভাবে মরেছে তারা? আর মরেও কি মরেছে তারা—

না-না—

মৃত্যুর যবনিকা সরিয়ে তারা যেন দ্বীপের বুকে এসে দাঁড়াল, এসে দাঁড়াল ছেলেটির চোখের সামনে, তার চারদিকে। অন্ধকার রাতে অতীতের কবর ভেদ করে মৃতেরা ফিরে এল, স্মরণের সোণার কাঠি তাদের প্রাণ দিল, মর্মরশব্দে তাদের দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয়, শুক্‌নো পাতা দলে পিষে তারা ছেলেটির চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কানের কাছে তাদের দুর্বোধ্য কথাবার্তা, হাসি, গান, প্রণয়-গুঞ্জন, নীল সমুদ্রের অতল থেকে যেন হাজারটা হারানো বছর ফিরে এল দ্বীপের বুকে। বাতাসে মৃতের দুর্গন্ধ।

সব একই রকম ছিল। সেই একই মানুষ, মানুষের সেই একই ধরণের আদবকায়দা, নীতি ও দুর্নীতি।

একজনের কাছে একশ'জন হার মেনেছিল, মাথা নত করেছিল, একজনের লোভ একশ'জনকেই লোভী করেছিল। ফলে ঘৃণার জন্ম হল, ভেদাভেদ বাড়ল, পরস্পরকে হনন করার প্রবৃত্তি বাড়ল, তাদের ঘৃণার সুযোগে দলাদলি সুরু হল, তারপর একদিন।—

প্রেতেরা চীৎকার করে উঠল, তাদের ঘৃণার তাণ্ডবে প্রকৃতি ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরস্পরের টুঁটি চেপে ধরল তারা,

পরস্পরকে হত্যা করল, লাল রক্তের ধারা এঁকে বেঁকে সমুদ্রের নোনা জলে গিয়ে নীল হয়ে গেল। তাদের দ্বীপের মাটিতে তাদের মাংস গলে গলে, হাঁড় গুঁড়ো হয়ে গেল, তাদের অতৃপ্ত আত্মা বাতাসে বাতাসে হাহাকার করে ভাসতে লাগল—

শরীর ঘেমে উঠল, ছেলেটি দু'চোখ বুজে তার চোখের সামনেকার সব বিভীষিকাকে এড়াতে চাইল। মনে মনে সে প্রার্থনা করতে লাগল—হে সূর্যদেব, তুমি উদিত হও, মৃত্যু-শীতল এই দ্বীপের ওপর তুমি কৃপা বর্ষণ করো, মৃত্যুর মত ভয়ংকর এই রাতকে তুমি ছিন্ন ভিন্ন করো।

ভোর হল।

সমুদ্রের অতল থেকে লাল সূর্য আবার বেরিয়ে এল। দ্বীপের বুকে কীট পতঙ্গ পাখী আর জানোয়ারদের প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগল।

ছেলেটি গাছ থেকে নামল। এবার? কি করবে সে?

সে একা।

মাথা নাড়ল সে, তার মনে পড়ল। মেয়েটা কোথায় গেল? শত্রুপক্ষের মেয়েটা?

ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। উদ্দেশ্যহীনভাবে। মেয়েটার জন্য নয়। সে বিষয়ে তার অধৈর্য হওয়ায় দরকার নেই। শিকার তো তার হাতের মুঠোতে। তার চেয়ে তীরভূমির কাছে

যেয়ে ঘুরে বেড়ানো যাক্। এক আধটা নৌকা বা জাহাজ হয়ত নজরে পড়তে পারে।

লোকালয় থেকে কত দূরে এই দ্বীপটা? চলতে চলতে ভাবে ছেলেটি। মনটা তার আকুলিবিকুলি করে। কত চেনা মুখ মনে পড়ে। মানুষের কাছে মানুষই যে সবচেয়ে দামী জিনিষ তা যেন এই দ্বীপে এসেই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করল সে। অথচ কি আশ্চর্য, মানুষের ভীড়ে থেকেই আমরা মানুষের মূল্য স্বীকার করি না।

খচ্‌মচ্ একটা শব্দ!

ছেলেটি বাঁদিকে ঘুরে তাকাল। সেই মেয়েটি।

প্রায় কুড়ি হাত দূরে, একটা সুন্দরী গাছের পাশে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে। তার শাড়ীটা দু'এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, তার চোখমুখে রাত্রিজাগার চিহ্ন। ঘৃণা ও ভয়ে বড় বড় দুটো চোখ মেলে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ছেলেটির চোখ জ্বলে উঠল, এগোল।

মুহূর্ত্তমাত্র। মেয়েটি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

"এই—শোন"—

ছেলেটি দৌড়োল।

মেয়েটি প্রাণপণে ছুটল, একবারও সে পেছন ফিরে তাকাল না।

"এই-এই—উঃ—"

হঠাৎ ছেলেটি বসে পড়ল। তার পায়ে কাঁটা বিঁধেছে।

বিড়বিড় করে মেয়েটির উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণ করল ছেলেটি। মেয়েটির বিষয়ে আজ আর কোন সম্মানবোধ নেই তার। কাল সে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছিল! আজ সে 'তুমি' বলল, হয়ত একটু পরেই 'তুই' বলবে। মার্জিত মনটা এক লাফে নীচে নামতে পারছে না, ধাপে ধাপে নামছে। পা থেকে কাঁটাটা বের করে সে উঠে দাঁড়াল। যাক্‌গে, ঘুরে ফিরে আবার মেয়েটা পড়বে তার সামনে। পড়তেই হবে।

আবার চলতে লাগল ছেলেটি।

টিলার উপরকার প্রাচীরটার ধারে গিয়ে পৌঁছোল সে। মস্ত বড় একটা অট্টালিকা ছিল সেখানে। হয়ত একটা ছোটোখাটো দুর্গ ছিল। মন্দিরের মত একটা বড় ঘরের আঁচ পাওয়া গেল এক জায়গায়, মাঝখানে একটা বেদীমত। কোন্ দেবতার বিগ্রহ ছিল এখানে? কারা থাকত! হিন্দু? মুসলমান? না, মুসলমান নয়। হয়ত পর্তুগীজ ডাকাতেরা এখানে একটা ঘাঁটি করেছিল, কয়েক ঘর কৃতদাসকে বসবাস করিয়েছিল। কে জানে। কিংবা হয়ত হিন্দু বা মুসলমানেরাই ছিল। হিংসা আর পাপের ফলে একদিন তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে ভাল হয়েছে কি? মানুষ থাকলে কি এত খারাপ লাগত এই দ্বীপটা? ছাই ভালো লাগত, কে জানে?

কি আছে ধ্বসাবশেষের মধ্যে?

কিছুই না। শুধু ইট আর পাথর। বড় বড় কাঠের থাম,

মরচে-ধরা, পুরোন ঢংয়ের লোহার আসবাবপত্র। ভাঙ্গা সিন্দুক।

আরো ঘুরল সে।

হঠাৎ একজায়গায় একটা মরচে-ধরা তলোয়ার আর বর্শাফলক পেল সে। সেই তলোয়ারের মাথাটা ভাঙ্গা কিন্তু ফলাটা অক্ষত আছে। ছেলেটি তুলে নিলে সে দুটো—খুব উপকারে লাগবে।

কারা ছিল এখানে? সে ভাবে।

টিলার দক্ষিণপ্রান্তে, প্রাচীরটার একপাশে একটা কামান দেখতে পেল সে। চেহারাটা বিদেশী। হয়ত একশো দুশো বছর আগেকার হবে, কিন্তু এখনো তার অধিকাংশ জায়গা মসৃণ আছে। আশ্চর্য।

কারা থাকত এখানে?

ছেলেটি স্কুলে পড়েছিল, ইতিহাস সম্পর্কে খুঁটিনাটি কিছুই জানা নেই তার। কিন্তু এটা সে বুঝতে পারল যে এখানে যারা পরাক্রমশালী ছিল তারা জাতে হয়ত পর্তুগীজ বা ইংরেজ ছিল। আর দ্বীপের নীচের দিকটাতে যে সব ধ্বংসাবশেষ আছে, সেখানে হয়ত ভারতীয় দাসেরা থাকত। আশ্চর্য।

অনেকক্ষণ সেখানে স্থির হয়ে বসে রইল সে। একটা দার্শনিক চিন্তা এসে তার মনকে আচ্ছন্ন করল। মানুষ কত ছোট, কত অসহায়! মানুষের সমস্ত কীর্তি আর চিহ্নকে কালস্রোত নিরন্তর ধুয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ মাথা নাড়ল ছেলেটি। না কালস্রোত তো মানুষকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি, মুছে ফেলতে পারেনি তার ইতিহাসকে। মানুষ ছোট, অসহায়, তবু মানুষ বিচিত্র জীব। চারদিকে পরিব্যাপ্ত ওই হিংস্র সমুদ্রের আক্রমণে শঙ্কিত এই দ্বীপের বুক থেকে মানুষেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেই বা, আবার কি মানুষ আসবে না এখানে? সে—সে-ই তো এসেছে। প্রকৃতি তাকে ধ্বংস করবে? করুক না। আমার সংগ্রামের ইতিহাস প্রকৃতির বুকে নিশ্চয়ই ক্ষতচিহ্ন আঁকবে, আমার মহত্ব, আমার শ্রেষ্ঠত্ব সেখানেই।

নিজের মনে হেসে উঠল সে, বিড় বিড় করে উঠল। আমি ভয় করি না। প্রকৃতি নিজেই ধ্বংস করে, মানুষই মানুষের ধ্বংস করে, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ধ্বংসের ক্ষমতা লুকিয়ে আছে বলেই তো আমার সব গেছে। কিন্তু ধ্বংসের পাশে সৃষ্টির ক্ষমতাও আছে। আমি সেই সৃষ্টির ক্ষমতাকে প্রকাশ করব, ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়েই আত্মরক্ষা করব, বাঁচতে চেষ্টা করব। আর বাঁচলেই আমি সৃষ্টি করতে পারব। যদি কোনদিন লোকালয়ে ফিরে না যেতে পারি তাহলে এই দ্বীপেই সেই সৃষ্টির মন্ত্রকে উচ্চারণ করব আমি। হ্যাঁ, আমি ভয় করি না, মৃত্যুর সীমান্ত ছুঁয়ে ফিরে এসেছি, আমি সহজে নিশ্চিহ্ন হব না।

ক্ষুধার ঘোষণা শুনল ছেলেটি। সে ফিরে চলল। রাস্তায় গরম লাগায় সে ঝিলের জলে স্নান করতে গেল। কিন্তু কি

করে স্নান করবে? কাপড় কই?/ এদিক ওদিক তাকাল সে। মেয়েটি কোথাও নেই তো? না। [redacted] সে, ঝুপঝাপ কয়েকটা ডুব দিয়েই তাড়াতাড়ি উঠে ধুতি ও গেঞ্জীটা পরে নিল। আঃ, শরীরটা যেন হাল্‌কা হয়ে গেল।

সেই গাছতলার আড্ডাতে সে ফিরে গেল। কালকের নারকেল এখনো আছে। তারি দুটো ভেঙ্গে সে খেল। আপাতত ঠাণ্ডা হল পেটটা। বিকেলে না হয় আমিষের চেষ্টা করা যাবে। ভাঙ্গা তলোয়ার আর বর্শাফলকটাকে পাথরে ঘষে ধারালো করতে হবে। মাছ কিংবা হরিণ একটা জোগাড় করতেই হবে।

খচখচ্ শব্দ। ছেলেটি তাকাল। গাছপালার আড়াল থেকে সে সবিস্ময়ে দেখল যে অতি সন্তর্পণে সেই মেয়েটা সেদিকে এগিয়ে আসছে।

একটু ভাবল ছেলেটা, তারপর তলোয়ার আর বর্শাফলকটা নিয়ে সে একটা গাছের আড়ালে লুকোল।

খচ্‌মচ্ শব্দটা কাছে এগিয়ে এল।

ছেলেটি নিশ্বাস বন্ধ করে একটু ঝুঁকে তাকায়। মেয়েটি তার সেই গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে, এদিক ওদিক তাকিয়ে সে তার লোভী ও সন্ত্রস্ত দৃষ্টিকে বাকী নারকেলগুলোর ওপর নিবদ্ধ করেছে।

একপা একপা করে নারকেল গুলোর দিকে এগোল মেয়েটি।

হঠাৎ ছেলেটি গাছের আড়াল থেকে লাফিয়ে পড়ল মেয়েটির সামনে, বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল তার একটা হাত।

মেয়েটি ভয়ে চমকে উঠল। এতটা আশা করেনি। প্রথমে তার চোখের তারায় একটা বিহ্বলভাব ঘনাল, পরে ত্রাস ঘনাল, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে সে চীৎকার করে উঠল, "বাঁচাও—কে আছো—আমাকে বাঁচাও—"

ছেলে হিংস্রভাবে হেসে উঠল, "কাকে ডাকছ? আমি ছাড়া আর কেউ কি এ দ্বীপে আছে?"

মেয়েটি গর্জে উঠল, "হাত ছাড়ো–"

"কি করে ছাড়ি– তুমি আমার শত্রু—"

"তুমিও আমার শত্রু—"

"ঠিক। আমরা পরস্পরের শত্রু। আর তাই আমি তোমাকে ধরেছি এখন—আমি শত্রুর শেষ রাখব না—"

মেয়েটি ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আমাকে তুমি মারবে?"

ছেলেটি দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ।"

মেয়েটি হাসল, বলল, "মারো। তোমরা তো আমাদের ধর্মের অনেক মেয়েকেই মেরেছ, আমিও না হয় মরব।"

ছেলেটি ঘৃণায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আর তোমরা? তোমরাই তো এবার দাঙ্গা সুরু করেছ। মেয়েমানুষকে খুন আর বেইজ্জৎ করায় তোমরাও পিছপাও নও—"

"আমরা?"

"হ্যাঁ।" ছেলেটি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, "আমি তোমার

সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতে রাজী নই—আমি তোমাকে—"

মেয়েটি বিষণ্ণ হেসে বলল, "হ্যাঁ, মারো।"

'ছেলেটি হাতের বর্শাফলকটিকে তুলে মেয়েটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল। তার শরীরটা হিংসায় ও ক্রোধে ফুলে উঠল। সে প্রতিশোধ নেবে! তার মা বাবা আর ভাইবোনদের মৃত্যুর শোধ নেবে সে।

কিন্তু মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন বিপ্লব ঘটল তার মনে। এতক্ষণ সে ভালো করে তাকায়নি, ঘৃণা আর হিংসায় তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল। এবার সে দেখল। দু'দিনেই শুকিয়ে গেছে মেয়েটি। চোখ দুটো বসে গেছে তার, গলাটা ভেঙ্গে গেছে। তার চোখের নীচে অনিদ্রা, ভয়, দুশ্চিন্তা ও ক্ষুধার কালো ছায়া গভীর হয়ে উঠেছে। শাড়ীটা আরো ছিঁড়ে গেছে তার, ললাট, হাত ও পায়ের জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে, রক্ত বেরিয়ে এসেছে সেই সব জায়গা থেকে। সব মিলিয়ে একটা বিয়োগান্ত মূর্তি। তারি মত একা মেয়েটি। এই নির্জন দ্বীপে মৃত্যুর মুখোমুখী। হয়ত তারি মত মেয়েটিরও সব মারা গেছে। তাছাড়া এই মেয়েটিকে কেন খুন করবে সে? তার তো কোন ক্ষতি করেনি সে। যারা দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে, যারা পুরুষের প্রাণ ও নারীর সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, তাদের তো কিছুই করতে পারল না সে। এই মেয়েটিকে খুন করে তার কি লাভ হবে? মেয়েমানুষ। ভাবতে তার পৌরুষ-বোধে আঘাত লাগল। তার শিক্ষিত মার্জিত, শান্তিপরায়ণ

আত্মা জাগ্রত হল, তার মনুষ্যত্ব বিজয়ী হল। থাক্ মেয়েটা, বাঁচুক, এই নির্জন দ্বীপের দ্বিতীয় অধিবাসী হোক সে।

ছেলেটি মেয়েটির হাত ছেড়ে দিল।

মেয়েটি বিষণ্ণ হেসে প্রশ্ন করল, "কি হল? আমায় মারবে না? মারো—আমার দুঃখ হবে না। আমার মা বাবা ভাই সবাই মারা গেছে—আমিই বা বাঁচব কেন? থেমো না, ঈশ্বর তোমাকে দিয়েই আমাকে মুক্তি দিবেন।"

ছেলেটি মুখ ঘোরাল, মাথা নেড়ে বলল, "না।"

"কেন?"

"আমার খুশী। তাছাড়া অত কৈফিয়ৎ দিতে আমি রাজী নই।

ছেলেটি প্রশ্ন করল, "আপনার হাত পা কেটে রক্ত বেরোল কি করে বলুন তো?"

মেয়েটি সলজ্জভাবে হাসল, "খিদের জ্বালায় নারকেল গাছে চড়তে গিয়েছিলাম, তারপর"—

ছেলেটি হেসে ফেলল, "পড়ে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ"—

"তারপর খিদের জ্বালায় শত্রুতা ভুলে গেলেন—আমার সম্পত্তি চুরি করতে এলেন?"

"হ্যাঁ"—

ছেলেটির মন নরম হয়ে গেল। সে বলল, "তাহলে আপাততঃ সন্ধি হোক্—নারকেল ভেঙ্গে দিচ্ছি—খান—"

মেয়েটি সভয়ে বলল, "আপাতত সন্ধি! তার মানে ভবিষ্যতে—"

ছেলেটি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, মেজাজের ওপর নির্ভর করছে সব কিছু। আমারও সবাই মরে গেছে"—

মেয়েটির চোখের দৃষ্টি শান্ত হয়ে এল, সমবেদনায় ভরে উঠল তা।

ছেলেটি ছুটো নারকেল ভেঙ্গে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিল।

"নিন"—

মেয়েটি মুখ তুলে তাকাল, তার চোখ চকচক করছে।

"দেখবেন, কাঁদবেন না যেন। বাপ্, কান্নার ব্যাপারে দেখছি ছুই সম্প্রদায়ের সব মেয়েই সমান। নিন্ খান"—

মেয়েটি নড়ল না, নিঃশব্দে সেই নারকেলের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধ হয় সে ভাবছিল। বাড়ীর কথা বাড়ীর প্রাচুর্যের কথা। ঠিক ছেলেটিরই মত।

কিন্তু ছেলেটি তা বুঝতে পারল না। সে ভাবল যে মেয়েটি হয়ত লজ্জা পাচ্ছে।

সে বলল, "লজ্জা হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা আমি না হয় আবার গাছের আড়ালে যাচ্ছি"—

মেয়েটির মুখে ক্ষীণ একটু হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

ছেলেটি অন্তরালে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে চেঁচিয়ে বলল, "কি? খাওয়া হল আপনার?"

কোন জবাব দিল না মেয়েটি।

ছেলেটির মনে একটু পরিহাসের লোভ জন্মাল। সে বলল, "খাওয়ার সময় আপনি কথা বলেন না বুঝি?"

এবারেও কোন জবাব এল না মেয়েটির।

ছেলেটি উঁকি মেরে দেখল। মেয়েটি নেই। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সে, চারদিকে তাকাল, তারপরে হেসে উঠল। মেয়েটি পালিয়েছে। শুধু হাতে নয়, তার দেওয়া নারকেল নিয়েই পালিয়েছে সে।

আরো হাসতে গিয়ে হঠাৎ থামল ছেলেটি। আশ্চর্য ভালো লাগছে তার, সমস্ত দেহ মনকে যেন অদ্ভুত পবিত্র মনে হচ্ছে। মাথার ওপরে বহ্নিমান সূর্যকে তার ভালো লাগল, ভালো লাগল বেঁচে থাকাকে। হ্যাঁ, প্রাণ নেওয়ার চেয়ে প্রাণ দেওয়াই বড়, প্রতিহিংসার চেয়ে ক্ষমাই মহৎ আর পশুত্বের চেয়ে মনুষ্যত্বই বড় ধর্ম।

আবার রাত এল।

দুপুরে আজ বাতাস বেশী ছিল না, সন্ধ্যে হতেই তা যেন দিনের বাকী হিসেব মেটাবার জন্য ক্ষেপে গেল। দক্ষিণ থেকে হু হু করে পাগলা হাওয়া ছুটে এল। শোঁ শোঁ শব্দ উঠল, নারকেল সুপারীর পাতায় পাতায়, ঝাউ আর সুন্দরীর গায়ে ধাক্কা খেয়ে যেন গোঙাতে লাগল বাতাস। যেন একটা উন্মত্ত প্রেত দ্বীপের অতীতকে কবর থেকে টেনে বের করতে লাগল। মোহানার বর্ষাস্ফীত জল, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস যেন নির্মম

নিরাসক্তির সঙ্গে দ্বীপের মানুষ আর জীব জন্তুর জন্ম-মৃত্যু, সব কিছুকেই নিশ্চিহ্ন করার জন্য ভয় দেখাতে লাগল। দ্বীপের মৃতেরা যেন বাতাস আর সমুদ্রের শাসানিতে আর্ত কোলাহল তুলল, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল, দ্বীপময় নিরাপত্তার জন্য ছুটোছুটি করতে লাগল।

ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। একটানা। হরিণের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক ভেসে আসে। মাথার ওপরে নিস্তরঙ্গ কালো সমুদ্রের মত মহাকাশ, তার বুকে নক্ষত্রদের কম্পিত দীপশিখা। নীচে দ্বীপের বুকে অন্ধকারে জোনাকীরা জ্বলে আর নেভে, সমুদ্রের তরঙ্গশীর্ষে বাড়বানল জ্বলে আর নেভে। জীবন-মৃত্যু মেশানো মহাগম্ভীর আকাশ আর সমুদ্রের তুলনায় নিজেকে আবার ছোট আর অসহায় মনে হতে লাগল ছেলেটির। অন্ধকারে জীব-জগৎকে আচ্ছন্ন করে দেয় প্রকৃতি, নিজের আদিম সত্তাটিকে প্রকাশ করে। সৃষ্টির প্রাক্-মুহূর্তের অন্ধকার। রহস্যময়। নিরাসক্ত ঈশ্বরের মত নির্লিপ্ত, নির্বিকার।

হঠাৎ ছেলেটি চমকে উঠল। অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি যেন দূরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। নিজেকে দমন করতে গিয়েও পারল না সে, ভয় পেল। ভালো করে তাকাল সে। অস্পষ্ট একটা নারীমূর্তি। কে? সেই মেয়েটি? না, আসবার হলে সে আগেই আসত। তবে? বহুদিন আগেকার কোন মৃতা নারী কি নিজের হারানো প্রেমিককে খুঁজে বেড়াচ্ছে এই দ্বীপে? কিংবা জলদস্যুদের হাতে বন্দিনী কোন নারী?

নারীমূর্তি দ্রুত এগিয়ে আসছে। তার দিকে!

"কে!" ভয়কম্পিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটি।

"আমি!"

ছেলেটি লজ্জা পেল। সেই মেয়েটি।

সে এগোল, তিরস্কারের সুরে বলল, "আপনার সাহস তো কম নয়। এই রাতের বেলা হাওয়া খাচ্ছেন? খাচ্ছেন তো বেশ করছেন, কিন্তু একটু সাড়া দিয়ে আসতে হয় তো?"

মেয়েটি কাছে কাছে এল, প্রশ্ন করল, "কেন?"

ছেলেটি বিরক্ত হল, "আমি তো আপনাকে পেত্নী ভেবে আর একটু হলে মূর্ছাই যাচ্ছিলাম"—

মেয়েটির মৃদু হাসি শুনতে পেল ছেলেটি, আরও বিরক্ত হয়ে সে বলল, "আপনি হাসছেন!"

"হ্যাঁ।"

"কেন জানতে পারি কি?"

মেয়েটি হাসল, "ভয় পেয়ে আমি এলাম আপনার এলাকায় অথচ আমাকে দেখে আবার আপনি ভয় পাচ্ছেন!"

মুহূর্তে ছেলেটির পৌরুষ জাগ্রত হল, সে মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল বলল, "আপনি ভয় পেয়েছিলেন? খুব?"

"হুঁ"—

"পাবেনই তো—না পাওয়াটাই অস্বাভাবিক। কাল রাতে ভয় পাননি?"

"পেয়েছিলাম।"

অন্ধকারে আবছা আবছা মেয়েটির মুখ দেখা গেল, সে হাঁপাচ্ছে।

ছেলেটি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "কাল ভয় পেয়েও কি করতে আজ একা থাকবার চেষ্টা করেছিলেন?"

"আপনার ভয়ে।"

ছেলেটি স্তব্ধ হয়ে গেল, একটু থেমে হেসে বলল, "আমার ভয়ে? কেন?"

মেয়েটি নরম গলায় বলল, "আপনি বলেছিলেন যে সন্ধিটা চিরস্থায়ী নয়।"

"আর চিন্তা করবেন না, সন্ধিকে চিরস্থায়ীই করলাম এবার।"

"ধন্যবাদ।"

"কিন্তু আমার ভয়কে জয় করলেন কি করে?"

"রাতের অন্ধকারে জন্তু জানোয়ারদের আপনার চেয়েও বেশী ভয়ের বস্তু বলে মনে হল, তাছাড়া একা"—

ছেলেটি মাথা নাড়ল, ভাবলোঃ ঠিক, মানুষ সামাজিক জীব—সে একা থাকতে পারে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষই মানুষের সহায়। বললো, "ভয় করবেন না, আমি আপনার ক্ষতি করব না।"

"আমার আর ভয় নেই।" মেয়েটি বলল।

ছেলেটি উৎসাহিত হল, পরিহাস করে বলল, "ভয় নেই? কেন? পুরুষ কি মেয়েদের কাছে ভয়ের বস্তু নয়?"

মেয়েটি কম্পিতকণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ।"

"তবে ? আপনার কি এখনো সাহস হচ্ছে ?"

"সমস্ত ভয়কে এড়াবার তো কোন উপায় নেই।" ডুবন্ত মানুষের হতাশা ধ্বনিত হল মেয়েটির কণ্ঠে। সেই বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর ছেলেটিকে লজ্জা দিল। সে দ্রুতকণ্ঠে বলল, "কিছু মনে করবেন না, একটু ঠাট্টা করলাম। পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া মানুষের চলে না, অথচ মানুষই মানুষের যে কি সর্বনাশ করেছে বা করছে তা কি গুণে শেষ করা যায় ?"

মেয়েটি জবাব দিল না।

ছেলেটি বলে চলল, "নির্জনে, অন্ধকারে, একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে পুরুষ যে নারীর ওপর কত অত্যাচার করেছে তা আমি জানি। জানি বলেই আপনাকে বলছি, আপনি আশ্বস্ত হোন। আপনাকে খুন করার পাপ-ইচ্ছাকে যেমন খুন করেছি আমি, আপনাকে অসম্মান করার পংকিল কামনাকেও তেমনি দমন করেছি আমি। আপনি নির্ভয় হোন, আমি আপনার প্রহরী।"

মেয়েটি নড়ে উঠল, ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপরে ধীরে ধীরে কৃতজ্ঞতায় ভারী হয়ে যাওয়া গলায় বলল, "ধন্যবাদ আপনাকে। আমি - আমি—"

ছেলেটি হাসবার চেষ্টা করল। অন্ধকারেও মেয়েটির হৃদয়াবেগ স্পর্শ করল তাকে।

সে বলল, "আমরা এখন মানুষের সমাজের বাইরে, সুতরাং সামাজিক আদব-কায়দাটাকে বর্জন করলেই ভালো হয়।"

মেয়েটি ভারী গলায় একটু হাসল।

ছেলেটি অবাক হল। আশ্চর্য। মানুষই মানুষের সাহস যোগায়। এই মেয়েটি এসে কাছে দাঁড়াবার পর যেন তার ভয় অন্তর্হিত হয়েছে, এই দ্বীপের মৃতেরা অদৃশ্য হয়েছে, বাতাসকে বাতাস বলেই মনে হচ্ছে। সমুদ্রকে কম ভয়াবহ ঠেকছে। আশ্চর্য! আবার খানিকটা আত্মগতভাবেই সে বলল, "মানুষই মানুষের সহায়, মানুষই মানুষের শত্রু। মানুষ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করে, লুণ্ঠন করে, শোষণ করে, হত্যা করে। তারই জন্য কত বুলি তৈরি করে তারা—আদর্শ, ধর্ম, ন্যায়, নীতি—ক-ত বড় বড় বুলি—"

ঘৃণায় ছেলেটির মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

নিস্তব্ধতা।

শুধু সেই অবিশ্রান্ত সমুদ্র গর্জন, বাতাসের শব্দ আর নারিকেল বনের বিষণ্ণ মর্মর-ধ্বনি।

ছেলেটি প্রশ্ন করল, "খুব ঘুম পাচ্ছে—না?"

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল, "হুঁ—"

"তাহলে এক কাজ করুন, এই গাছটার ওপরে উঠে শাড়ীর আঁচল দিয়ে ভালোভাবে ডালের সঙ্গে বাঁধুন নিজেকে। উঠতে পারবেন?"

"পারব।"

"তাহলে উঠুন।"

"হুঁ—"

পাশাপাশি দুটো গাছে উঠে তারা বসল।

ছেলেটি প্রশ্ন করল, "ঠিক আছে ?"

"হ্যাঁ—"

"একটু কষ্ট হবে, কিন্তু উপায় নেই।"

"তা জানি।"

"ভালো করে ঘুমোন, অন্ধকার আপনার লজ্জাকে হরণ করবে।"

"ভালো কথা, আপনার নাম কি বলুন তো ?—"

"নাম !"

ছেলেটি মাথা নেড়ে একটা কথা বলতে গিয়েই যেন শিউরে উঠল, দ্রুতকণ্ঠে সে বলে উঠল, "না না, নাম শুনতে চাই না। বুঝলেন, আপনার আমার কোন নাম নেই—"

মেয়েটি হাসল, বলল, "আচ্ছা—"

"কেন জানেন ? নাম শুনলেই হয়ত আমাদের অতীতের কথা মনে পড়বে, আবার হিংসায় আচ্ছন্ন হব। না, নামে দরকার নেই—আমরা মানুষ, তাই যথেষ্ট।"

"আচ্ছা।"

নিস্তব্ধতা।

রাত বাড়তে লাগল।

আকাশের বুকে পরিব্যাপ্ত মহাশান্তি। একফালি খণ্ডচাঁদ এবার অস্তে গেল। দূরে একদল শেয়ালের প্রহর ঘোষণা শোনা গেল।

ছেলেটি ডাকল, "শুনছেন ?—"

মেয়েটি সাড়া দিল, "বলুন।"

"ঘুমোন্‌নি ?"

"না।"

"কেন ? ভাব্‌না হচ্ছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"বাড়ীর কথা, আত্মীয় বন্ধুর কথা ভাবছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"বাড়ী ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে ?"

"হ্যাঁ।"

"দাঙ্গার ভয়কেও তুচ্ছ মনে হচ্ছে, তাই না ?"

"হ্যাঁ।"

"আশ্চর্য। আমারো তাই ইচ্ছে হচ্ছে। অথচ কি করব গিয়ে ? বাড়ী পুড়ে গেছে, বাড়ীর সবাই জলে ডুবে মারা গেছে—আর"—

মেয়েটি বলল, "আপনার গল্প বলুন—আমি শুনব।"

"শুনবেন ? আচ্ছা—"

নিজের কাহিনী বর্ণনা করে ছেলেটি থামল, থামতেই শুনতে পেল যে মেয়েটি কাঁদছে। অবাক হয়ে সে বলল, "এ কি ! আপনি কাঁদছেন কেন ?

কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বলল, "আপনার দুঃখ আর আমার দুঃখ এক বলে কাঁদছি।"

ছেলেটির গলা ধরে এল, তবু সে বলল, "কান্না তো মেয়েদের স্বভাব। সে কথা যাক্, আমার কাহিনী তো শুনলেন, এবার আপনারটা বলুন।"

মেয়েটি বলল। সে বাড়ীতে অনেকদূর পর্যন্ত লেখা-পড়া করেছে। তাদের পরিবারের রুচি আছে। গোপালপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী রসুলপুরে তাদের বাস। গ্রামটিতে তাদের সম্প্রদায় সংখ্যালঘু। পূর্ববঙ্গের ও কলকাতা'র দাঙ্গার কথায় গ্রামে উত্তেজনা ছড়াল। শেষে একদিন ফেটে পড়ল সেই উত্তেজনা, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একশ' জন তলোয়ার বন্দুক নিয়ে তাদের সম্প্রদায়কে হত্যা করতে প্রবৃত্ত হল। মেয়েটির বাপ, মা আর ভাই তাকে নিয়ে নদীর ঘাটে পালিয়ে একটি নৌকোতে চড়ে গোপালপুরের উদ্দেশ্যে পালাল। কিন্তু কিছু দূর যেতেই ঝড় উঠল। তারপর আরো কিছুদূর যেতেই ঝড়ের চেয়েও আর একটা বড় বিপদ হল—একটা সংখ্যাগুরুদের নৌকো তাদের তাড়া করল চিনতে পেরে। সে কি সাংঘাতিক ব্যাপার! ঝড়ে মেতে-ওঠা নদীর বুকে তাদের ছোট্ট ডিঙিটা টলমল করতে করতে পালাতে লাগল। কিন্তু কিছুই হল না। শত্রুরা সংখ্যায় বেশী ছিল, প্রত্যেকেই তারা পুরুষ এবং বলবান। ফলে তারা ধরা পড়ল। মাঝ-নদীতে বিভীষিকা নেমে এল। তার বাপ, মা ভাইকে কুচি কুচি করে তারা কাটল—তার চোখের সামনে দু'তিন জন তার পোষাক ছিঁড়ে ফেলে অঙ্গস্পর্শ করে, অশ্লীল রসিকতা করে বলল যে, তারা বিধর্মী নারীর ওপর

অত্যাচার করার শোধ নেবে এবার। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ঈশ্বরের ক্রোধ তাদের ওপর বর্ষিত হল, নৌকোটা কাৎ হয়ে ডুবে যাবার উপক্রম হল। তারা—নৌকোটা সামলাতে ব্যস্ত হল, কিন্তু পারল না। নৌকো ডুবল না বটে কিন্তু তীরবেগে তা সাগর-সঙ্গমের দিকে ছুটে চলল। মাথাটা যেন খারাপ হয়ে গেল মেয়েটির। বাপ, মা আর ভাইয়ের কাটা দেহ, রক্তের স্রোত, ঘাতকদের হিংস্র লালসা আর ঝড়ে ফুলে ওঠা নদীর ভয়ংকর রূপ যেন তার জ্ঞানকে হরণ করল। নৌকোটা যে কত দূর ঝড়ের বেগে ভেসে গিয়েছিল সে খেয়াল তার ছিল না। হঠাৎ যখন জ্ঞান ফিলে এল তার, তখন সে বেঁচে থাকার আর কোন অর্থ ই খুঁজে পেল না, সমস্ত পৃথিবী তার কাছে নরকের মত মনে হতেই হঠাৎ নৌকোটা এবার একেবারে কাৎ হয়ে পড়ল।

তারপর—

মেয়েটি থামল, কান্নায় বিকৃত কণ্ঠে বলল, "তারপর আর কিছুই মনে নেই—জ্ঞান হতেই দেখলাম এই দ্বীপকে আর আপনাকে—"

ছেলেটি অন্ধকারে চোখের জল মুছল, ধরা-গলায় বলল, "কান্না থামান—মেয়েদের স্বভাব ভারি খারাপ। কি হবে কেঁদে? আমার কথা ভাবুন, আপনি একা নন্। আমরা শত্রু—কিন্তু দুঃখই আজ আমাদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছে, চিরস্থায়ী সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করেছে। থামুন—যা হবার হয়েছে, আমাদের

বাপ, মা, ভাই, বোনেরা সবাই নিজেদের ভূমিকায় যথাযথ ভাবে অভিনয় করেছে। তাদের জীবনে পঞ্চম অঙ্কের যবনিকাপাত হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের নাটক এখন নতুন করে নতুন রঙ্গমঞ্চে শুরু হল। দেখা যাক্, কি কি নাটকীয় ঘটনা ঘটে— কিন্তু এ কি! আমরা যে শুধু বকবকই করছি! না, আপনি ঘুমোন, আমি চুপ করলাম।”

ছেলেটি চুপ করল। মেয়েটিও শব্দ করল না।

বাতাস বইতে লাগল, গর্জাতে লাগল, দ্বীপের বুকে রাত গভীর হয়ে উঠল।

ছেলেটি এক সময়ে আবার সন্তর্পণে ডাকল, “ঘুমিয়েছেন ?”

মেয়েটি সাড়া দিয়ে বলল, “হ্যাঁ।”

ছেলেটি রাগতস্বরে বলল, “ছাই ঘুমিয়েছেন। আপনি কি তা হলে ঘুমের ঘোরে কথা বলছেন ?”

মেয়েটি হাসল, বলল, “হ্যাঁ, ওটা আমার অভ্যেস !”

“অভ্যেস নয়, ওটা বদ-অভ্যেস !”

মেয়েটি জবাব দিল না।

“ঘুমোলেন ?”

“কথা বলবেন না, আমি ঘুমোচ্ছি।”

ছেলেটি হাসল। মেয়েটি যে হাতের তালু দিয়ে চোখের জল মুছল তা সে বুঝতে পারল না। অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারেও সে এটুকু বুঝল যে, দুঃখের সেতু তাদের দুজনকে আজ মনুষ্যত্বের পথ দেখাল।

মেয়েটির ডাকে ঘুম ভাঙল ছেলেটির। গাছ থেকে নেমে সে তাকাল চারিদিকে। ভোর হয়েছে। দ্বীপের পাখীরা কলরব করছে।

সে বলল, "ঘুমিয়েছিলেন তো?"

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ—"

ছেলেটি হাসল, "অভ্যেস যাবে কোথায়? রীতিমত খিদে পেয়েছে "

"পাবেই তো।" মেয়েটি বলল।

"পাবে মানে? জায়গা-বিশেষে খিদের সংযত হওয়া উচিত।"

মেয়েটি সকৌতুকে বলল, "তাই তো—তা হলে তো খিদে পাওয়া সত্যি অন্যায়।"

ছেলেটি মাথা নাড়ল, "হুঁ – তা ভাবনা কিসের, নারকেল আছে।"

মেয়েটি যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে বলল, "অথচ এককালে নারকেলের দিকে ফিরেও চাইতাম না—"

ছেলেটি গম্ভীর হয়ে গেল। সত্যি সঙ্গে সঙ্গেই সে তরলকণ্ঠে বলল, "ওসব কথা থাক। কি খাবেন বলুন দেখি?"

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল, "তার মানে?"

"ভাত ছাড়া আর কি খেতেন আগে?"

"মাছ, মাংস, দুধ—"

"উঁহু, দুধ পাবেন না, কিন্তু মাছ মাংস পাবেন। আজ মাছ হোক, কি বলেন?"

"আপনার মাথা খারাপ হয়েছে।"

"না।" ছেলেটি সহাস্যে তাকাল মেয়েটির দিকে, বলল, "মাছ খাওয়াতে পারি, কিন্তু—"

"আপনি কি যাত্নকর নাকি ?"

"প্রায়। তবে জানেন তো, যাত্নকরদের মালমস্‌লা কিছু দরকার হয়।"

"হয়ই তো—"

"আমারও একটা জিনিস দরকার—জাল।"

"তা পাচ্ছেন কোথায় ?"

"কেন ? আপনার শাড়ীটা ?"

মেয়েটির মুখে লজ্জা ঘনাল।

ছেলেটি মোলায়েম গলায় বলল, "লজ্জা করবেন না, আপনার জামা আছে, সায়া আছে, কিছুক্ষণের জন্য শাড়ীটা ধার দিন। এই আত্মত্যাগটা করার উপায় আমার নেই—"

মেয়েটি লজ্জায় মাথা নীচু করে বলল, "বুঝলাম, তা দেব'খন—"

"তাহলে চলুন—একা তো আর জাল টানতে পারব না—"

"মানে! আমি—"

"হ্যাঁ, লজ্জা কি ? এই নির্জন দ্বীপে আত্মরক্ষা করতে গেলে কি লজ্জা শোভা পায় ?"

"বুঝেছি।"

"তবে চলুন।"

"এখুনি ?"

"হ্যাঁ। বলিনি যে খিদে পেয়েছে ?"

মেয়েটি হেসে উঠল, "ধন্যি আপনার খিদে—মাগো, নিন্ চলুন।"

ঝিলের ধারে গেল দুজনে। তলোয়ার, বর্শাফলক ও শিকটাকেও নিয়ে গেল ছেলেটি। মেয়েটি একটা গাছের আড়াল থেকে শাড়ীটা খুলে নিয়ে এল। ছেলেটি মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে তাকাল। মেয়েটি সুন্দরী। নীল রংয়ের সায়ার ওপর নীল রংয়ের ব্লাউজ। শাড়ীটা অন্তর্হিত হওয়ায় তার যৌবন-সমৃদ্ধ দেহরেখা এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দেখে যেন নেশা জাগতে চাইল ছেলেটির মনে।

মাথা নীচু করে লজ্জারক্তিম হ'য়ে মেয়েটি বলল, "মাছ ধরবেন, না লজ্জা দেবেন আমাকে ?"

ছেলেটি চমকে উঠল, লজ্জিতকণ্ঠে বলল, "ছি ছি, মাপ করবেন আমাকে। আসুন—"

নিজের মনকে তিরস্কার করল ছেলেটি। সাবধান! এই দ্বীপটা আদিম পৃথিবীর মত, শয়তান এখানে পেছনে পেছনে ঘোরে। সাবধান, নিজের প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ করো।

জলের মধ্যে নামল দুজনে। শাড়ীটা দু'ভাঁজ করে, দু'দিকে দু'জনে ছেঁকা জালের মত ধরে তীরের দিকে চলতে লাগল তারা। খানিকটা বাদে তারা শাড়ীটা তুলল, আনন্দে উৎসাহিত হয়ে উঠল। চার-পাঁচটা ছোট ছোট পোনামাছ আট্‌কা পড়েছে।

আবার জলের মধ্যে নামল তারা। বার কয়েক এমনি পরিশ্রম করে ডজনখানেক মাছ তুলল তারা।

মেয়েটি বলল, "আর দরকার নেই, এবার চান্ করে উঠুন।"

দু'জনে ডাঙ্গায় উঠল। ছেলেটি মাছগুলো জড় করে নিল।

মেয়েটি মুখ টিপে হাসতে লাগল।

ছেলেটি সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "হাসছেন কেন?"

"মাছ দেখে।"

"কি হল মাছের মধ্যে?"

"মাছ তো ধরলেন, খাবেন কি করে?"

ছেলেটির মুখে কপট গাম্ভীর্য ছড়িয়ে পড়ল, সে বলল, "একটা উপায় আছে।"

"কি?"

"কাঁচা খেতে হবে চিবিয়ে চিবিয়ে। স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ভালো।"

মেয়েটি হাসল, বারংবার মাথা নেড়ে বলল, "আমার দ্বারা হবে না তা, কিছুতেই না, আমি বরং ওই নারকেল চিবিয়ে খাবো।"

ছেলেটি অভয় দিয়ে বলল, "আপনি এখানেই থাকুন, আমি ব্যবস্থা করছি। শুধু নারকেল চিবোতে হবে না আপনাকে।"

"কিন্তু এখানে থাকব কেন?"

"এদিকেই থাকা যাক। জলের ধারে থাকাটাই সুবিধেজনক, তা নইলে জলের জন্য দু-তিনবার করে আসতে হয়।

একা ছিলাম বলেই সমুদ্রের ধারে ছিলাম, এখন তো খানিকটা ভয় কমেছে।"

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, "বেশ, আপনি যান, আমি ততক্ষণে শাড়ীটা শুকিয়ে নিই।"

ছেলেটি চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল সে। তার হাতে দুটো জ্বালানি কাঠের খণ্ড আর দুটো পাথরের টুকরো।

মেয়েটি ততক্ষণে ভিজে শাড়ীটা শুকিয়ে পরে নিয়েছিল, ছেলেটিকে দেখে বলল, "ওগুলো এনেছেন কেন?"

ছেলেটি রহস্যময় ভঙ্গীতে বলল, "দেখতে পাবেন, সবুরে মেওয়া ফলবে। কই, মাছের খোসা ছাড়িয়েছেন আপনি?"

"না তো।"

"তা হলে ছাড়ান চটপট।"

ছেলেটি শুকনো ডাল আর পাতা কুড়িয়ে এক জায়গায় জড় করল। মেয়েটি মাছের আঁশ ছাড়িয়ে জল থেকে ধুয়ে নিয়ে এল।

ছেলেটি প্রশ্ন করল, "কি খবর? আপনি তৈরি?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে ভোজবাজী দেখুন এবার।"

পাথরের টুকরো দুটোকে ঘষে ঘষে ছেলেটি আগুন জ্বালল, তারপর শুকনো পাতার স্তূপে সেই আগুনকে ধরিয়ে দিল সে। দাউ দাউ করে পাতাগুলো জ্বলে উঠল। সেই আগুনের

আভায় ছেলেটি আর মেয়েটির মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা নিঃশব্দে হাসল। হোক দ্বীপটা নির্জন ও মৃত্যুময়, এই আগুনই তাদের বাঁচাবে। আগুনের বিসর্পিল শিখা যেন সেই অভয়বাণীই ঘোষণা করছে।

আগুনে ঝলসানো মাছ আর নারকেল। নতুন পরিবেশে নতুন রকমের খাদ্য। খাওয়া সেরে দু'জনেই চুপ করে বসে ছিল। দুজনেই ভাবছিল। মনকে সংযত করা যায় না। খেতে খেতে বাড়ীর কথা মনে পড়েছিল তাদের, মনে পড়েছিল আত্মীয়বান্ধবের কথা। অথচ কি যেন ঘটে গেল রাতারাতি, সব স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। দক্ষিণাবায়ুর শন্ শন্ শব্দ, ঝাউ আর নারিকেল সুপারীর দীর্ঘশ্বাস শুনতে শুনতে তারা অন্যমনে ভাবতে লাগল।

তখন সূর্যালোকে অপরাহ্নের রং ধরেছে। সুন্দরী বনের ভেতর থেকে ঘুঘু আর ডাহুকের ডাক ভেসে আসছে। ভিজে মাটির ওপর, ঘাসবনের আড়ালে বসে পতঙ্গেরা ঘুমোচ্ছে, প্রজাপতিরা স্বপ্ন দেখছে।

ছেলেটি বলল, "কি ভাবছেন ?"

মেয়েটি মুখ তুলল, তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন।

ছেলেটি বিষণ্ণ হেসে বলল, "হারানো মানুষদের কথা ভাবছেন ? কিন্তু কেন ? –"

মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে উঠল সশব্দে।

ছেলেটি আর কথা খুঁজে পেল না। তারও চোখে যেন জল আসতে চাইল। চুপ করে রইল সে। মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। শেষে অনেকক্ষণ বাদে থামল সে।

ছেলেটি তিক্ত কণ্ঠে বলল, "মেয়েদের স্বভাব খারাপ—শুধু কান্না আর কান্না—ছিঃ—"

নিঃশব্দতা।

ছেলেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আশ্চর্য—"

মেয়েটি বুঝতে পারল না, প্রশ্ন করল, "কি?"

"মানুষ। তার এত বুদ্ধি, এত ক্ষমতা—অথচ পরস্পরকে হত্যা করে তারা—ঘৃণা করে!"

"হুঁ—"

"কিন্তু কেন? এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে কেন খুন করবে?"

"আমার মনে হয় দু'পক্ষেরই দোষ আছে।"

মেয়েটি মাথা নাড়ল, "কি করে? দাঙ্গা প্রথমে যে শুরু করে—তারই তো দোষ—"

"তার কি কারণ নেই?"

"কি কারণ?"

"তাদের দারিদ্র্য।"

"কেন দরিদ্র হল তারা—সে তো বিদেশীদের ষড়যন্ত্র। আসলে তা নয়, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই একা ভারতবর্ষ শাসন করার

স্বপ্ন দেখে। অতীত সাম্রাজ্য এখনো তাদের মনে বাসা বেঁধে আছে।”

“যাদের গৌরবময় অতীত থাকে, তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নও থাকে।”

“কিন্তু ন্যায়? ধর্ম?”

“মানুষ কি কোন দিন ন্যায়ধর্ম পালন করেছে?”

“এ তো যুক্তি নয়।”

“পৃথিবী যুক্তি মানে না।”

“সেই জন্যই তো শান্তি নেই পৃথিবীতে।” ছেলেটি বিষণ্ণ-ভাবে মাথা নেড়ে বলল, “হিংসায় পৃথিবী অন্ধ হয়ে গেছে। আর হিংসায় শুধু হিংসা বাড়ে। বীজ থেকে গাছ। গাছ থেকে ফল, আবার ফল থেকে বীজ—এমনি ভাবে চিরকাল চলতে থাকে। কিন্তু তাই কি চলবে?”

মেয়েটি চুপ করল, কি যেন ভাবতে লাগল।

ছেলেটি বলল, ‘না। ভাল না বাসলে শান্তি নেই—হয় দেশকে, নয় তো মানুষকে—ভালবাসতেই হবে। আর ভালবাসা মানে শুধু ভোগ নয়, ত্যাগও বটে।”

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলল, “ভালবাসা তো এক তরফ থেকে হয় না—দুই সম্প্রদায়ই পরস্পরকে অস্পৃশ্যের মত দূরে সরিয়ে রেখেছে চিরকাল।”

“ঈশ্বর সম্পর্কে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজেদের মতকে অভ্রান্ত বলে মনে করে। ঈশ্বর কি তাদের একচেটিয়া?”

মেয়েটি আবার চুপ করল।

ছেলেটি বলে চলল, "উভয় পক্ষেরই দোষ ছিল—ঈশ্বরকে কেউই চায় নি, কারণ ঈশ্বর একমাত্র ভালবাসার মধ্যেই বীজাকারে থাকেন।"

"ঈশ্বর কি নিরাকার?"

"পৃথিবীতে কিছুই নিরাকার নয়। আকার নেই কল্পনা করাও একপ্রকারের আকারকে স্বীকার করা। আসল ব্যাপার তা নয়। ব্যাপার এই যে, ধর্ম মানুষের মনে এখনো দাগ কাটেনি"

"কেন?"

"বৈষম্য। মানুষকে তা সমাজের মধ্যে যে ভোগী এবং শক্তিশালী তাকেই অনুকরণ ও অনুসরণ করতে শেখায়, জন্তুর স্থূল ভোগধর্মকেই তা চিরস্থায়ী করে মানুষের আত্মিক উন্নতির অবকাশকে হরণ করে। তাই স্বার্থচিন্তা করে মানুষ, স্বার্থের জন্যই মানুষ ধর্মকেও অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। নিজের ভোগ-লালসাকে নিরাপদ করার জন্য দেশজয় করে, নরহত্যা করে, ভাইকে বাপকে পর্যন্ত খুন করে।"

মেয়েটি তাকাল ছেলেটির দিকে, যেন সে কথাগুলো বুঝতে চাইল।

ছেলেটি হাসল, "একটু কষ্ট হচ্ছে বুঝতে, তাই না? কিন্তু ঠিক বুঝবেন। এখানে তো স্বার্থ নিয়ে কলহ হবে না আমাদের—ধীরে ধীরে সব বুঝবেন। শুনুন, ধর্ম ঈশ্বরকে

পাবার পথ আর ঈশ্বর মানে সত্য, সৌন্দর্য্য এবং ভালবাসা। কি অর্জন করবেন তারই নির্দেশ দেয় ধর্ম: বলে, সৎ হও, হিংসাকে বর্জন করো, প্রতিবেশীকে ভালবাসো, নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখো, সেখানে ঈশ্বরের সাম্রাজ্য বিস্তৃত। যে সেই নির্দেশ পালন করে সে-ই মানুষ, মানুষ না হতে পারলে ঈশ্বরলাভ ঘটে না। মানুষ হয়ে জন্মালেই মানুষ হয় না, গোলাপের কলি কখনো গোলাপ নয়। বিকশিত হয়ে গোলাপের সৌরভ অর্জন করার পরেই সেই কলি গোলাপ হয়, মনুষ্যত্বকে অর্জন করলেই মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়। আর ধর্মই সেই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে। যে ধর্ম তা করতে পারে না, যে ধর্ম মানুষকে শুধু হিন্দু, মুসলমান আর খৃষ্টানই করে রাখে তা ব্যর্থ।"

মেয়েটি হাসল, "তাহ'লে সব ধর্মই ব্যর্থ?"

ছেলেটি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ—তা বলতে পারেন।"

"তা হ'লে উপায়?"

"বৈষম্য দূর করতে হবে—মানুষের জাস্তব জীবনকে নিরাপদ করতে হবে—ধর্মকে যারা স্বার্থের অস্ত্র করেছিল তাদের নির্মূল করতে হবে, স্বার্থের জন্য যারা মানুষকে শোষণ ও নির্যাতন করেছে তাদের ধ্বংস করতে হবে। তা হলেই ধর্ম মনুষ্যত্বকে বিকশিত করবে।"

"তারপর?"

"মানুষের পৃথিবী—ভৌগলিক সীমারেখা থাকলেও ধর্ম

এক—ধর্ম এক বলেই রাজ্য এক। তখন শুধু নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসা আর ভালবাসলেই তো চিরস্থায়ী শান্তি।"

মেয়েটি লঘু কণ্ঠে হেসে উঠল, "আপনি যে মস্ত বড় বড় কথা বলছেন—উঃ! আপনি দিনরাত এইসব স্বপ্ন দেখেন?"

ছেলেটি সতেজে বলল, "স্বপ্ন দেখত বলেই মানুষ এতদূর পৌঁচেছে। দেখবেন, আজকের স্বপ্নই কালকের সত্য হবে।"

মেয়েটি হাসল, তারপরে হঠাৎ একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল। কি এক অন্তর্দোলায় দোলায়িত হয়ে সে গাঢ়স্বরে বলল, "কোন দিন আপনার মত এভাবে ভাবিনি। সত্যি, বরাবর ভেবেছি যে আমার ধর্ম এবং আমরা টিকলেই হল—অথচ একথা একবারও ভাবিনি যে প্রকৃতির বুকে একা টিঁকে থাকা অসম্ভব। একটি লোকেরও নয়, একটি জাতেরও নয়। তাই যেন হয়, আপনার কথাই যেন সত্যি হয়, ভগবান যেন তাই করেন।"

ছেলেটি ঠোঁট ওলটাল, "ভগবান! তাঁর কথা থাক—ও কাজ আমাদেরই করতে হবে।"

"কেন? ভগবানের ওপর বিশ্বাস নেই আপনার?"

ছেলেটি একটু থতমত খেয়ে ভাবল, "থাক্। এ-কথার জবাব আজ আর দেব না আপনাকে।"

"কেন?" মেয়েটির চোখে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"অনেক তত্ত্বকথা বললাম—আর ভাল লাগছে না।"

এত তত্ত্বকথা জানলেন কি করে?"

"বিপাকে পড়ে,—আপনিও জানতে পারবেন। কিন্তু এবার থামুন দেখি, দোহাই, একটু ঘুমোই—"

মেয়েটি হাসল, "ঘুমোন।"

ছেলেটি গাছতলায় শুয়ে পড়ল। ঝিরঝিরে বাতাসে দেহটাও একটা মৃদু মর্মরধ্বনি তুলেছে যেন। অর্ধনীমিলিত চোখে সে মেয়েটির দিকে একবার তাকাল। মেয়েটি ভাবছে। তার পরিপুষ্ট ঠোঁট দুটি আলতো হয়ে কাঁপছে, যেন সে নিজের মনে কথা বলছে। তার ডাগর চোখের গভীর কৃষ্ণবর্ণ তারা দুটোতে যেন বহুদূরবর্তী নক্ষত্রালোক। রুক্ষ কোঁকড়ানো চুল-গুলো মস্তবড় খোঁপায় বাঁধা পড়ে কুণ্ডলায়িত অজগরের মত পড়ে আছে। বাঁকা ভুরু, নিটোল বাহু, পদ্মকলির মত আঙ্গুল-গুলো, উন্নত বক্ষদেশ। ছেলেটি শিউরে উঠল। এই দ্বীপটা যেন সেই আদিম জগৎ। সে যেন সেই আদিম পুরুষ, আর তার পেছনে পেছনে যেন শয়তান্ ঘুরছে, তাকে প্রলুব্ধ করছে। সাবধান শয়তান, সাবধান! সে চোখ বুজল।

পাখীর ডাক ভেসে আসে। ভেসে আসে বুনো ফুলের গন্ধ।

মধ্যদিনের সূর্য্যালোকে সমুদ্রের নীল জল চিকমিক করে। অন্তহীন তরঙ্গরাশি বিরামহীন গড়িয়ে চলে।

হঠাৎ মেয়েটি ফিস ফিস্ করে ডাকল, "শুনছেন—"

ছেলেটি চোখ মেলে তাকাল, "কি হল?"

মেয়েটির চোখে মুখে খুশির ছায়া, সে বলল, "তাকিয়ে দেখুন, ঐ যে—"

হাত দিয়ে দেখাল সে—ছেলেটি তাকাল। প্রায় একশ হাত দূরে, ঝিলের ধারে তিন চারটি হরিণ এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, উৎকর্ণ। এদিক ওদিক তাকিয়ে তারা জলের ধারে গেল, মৃদু শব্দ করতে করতে জলের ওপর মুখ নিয়ে গেল।

মেয়েটির চোখের তারাও যেন হরিণের মত, তাদেরই মত গ্রীবা দুলিয়ে সে বলল, "ভারী সুন্দর, না?"

ছেলেটি চোখ বুজে আবার শুয়ে বলল, "হুঁ—"

"ওকি! ঘুমোচ্ছেন!"

"হ্যাঁ! সুন্দর জিনিস বেশিক্ষণ দেখতে নেই"

মেয়েটি লঘুকণ্ঠে হাসল। তার সেই হাসির শব্দ যেন একটা উচ্ছল ঝরণাধারার মত ছেলেটির চেতনার ওপর ছড়িয়ে গেল, ঠাণ্ডা করে দিল, তার সারা দেহে বাষ্পাকার ঘুমের মত মিশে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল সে জানে না। ঘুম ভাঙল মেয়েটির চীৎকারে।

"শুনছেন? উঠুন—শিগ্গীর উঠুন—শিগ্গীর—"

চোখ মেলে ছেলেটি দেখল যে মেয়েটি ঘামে নেয়ে উঠেছে, কাঁপছে, চোখে মুখে তার উন্মত্ততা।

"কি হল? হরিণ?—"

"না না, আস্থন - "

"সাপ"

"না—না" - মেয়েটি চীৎকার করে উঠল, "জাহাজ—আমি একটা জাহাজ দেখতে পেয়েছি—"

"কি !" ছেলেটি লাফিয়ে উঠল, সামনের দিকে দৌড়োল।

মেয়েটি চেঁচাল, "ওদিকে নয়, এই দিকে, এই দিকে"—ডান দিকে দৌড়োল সে, ছেলেটি তাকে অনুসরণ করল।

তীরভূমির পাশে গিয়ে মেয়েটি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাল দূরে' দিগন্তের কোল ঘেঁষে একটা জাহাজ চলে যাচ্ছে।

"চেঁচান—ডাকুন"—মেয়েটি কেঁদে বলল।

ছেলেটি চেঁচাল, "হোই-ই-ই—হোই-ই-ই—"

আবার চেঁচাল সে, হাত নাড়ল, ডাকল, "আমাদের নিয়ে যাও ভাই-ই-ই—শোনো-ও-ও-ও—"

একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এল ছেলেটি, প্রচণ্ড জোরে মাথার ওপর আন্দোলন করতে লাগল।

মেয়েটি পাগলের মত তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাল, "আমাদের নিয়ে যান—নিয়ে যা-ন—"

যতক্ষণ জাহাজটাকে দেখা গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত অক্লান্তভাবে চীৎকার করল তারা, লাফাল, চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেলল। কিন্তু কিছুই হল না। জাহাজটা ধীরে ধীরে দিগন্তে অদৃশ্য হল।

চুপ করে রইল তারা।

সূর্য পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ছেলেটি মেয়েটির অশ্রু-প্লাবিত মুখের দিকে তাকাল। তারও হৃদয় আলোড়িত। কে থাকতে চায় এই নির্জন দ্বীপে? মানুষ হিংসোন্মত্ত, তবু সেই মানুষ ছাড়া যে থাকা যায় না। কর্মে, ঘর্মে, জীবনের সহস্র জটিলতায়, স্নেহ প্রীতি ঈর্ষা দ্বেষের আবর্তের মাঝে জীবনের যে বিচিত্র স্বাদ তা এখানে কোথায়?

মেয়েটিও ছেলেটির দিকে তাকাল, তারপরে দৃষ্টি নামাল ছেলেটির পায়ের দিকে। হঠাৎ সে চমকে উঠল, লাফিয়ে ছেলেটির হাত ধরে প্রচণ্ড জোরে আকর্ষণ করল একপাশে। ছেলেটি প্রস্তুত ছিল না, একপাশে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

"কি হল?" ছেলেটি প্রশ্ন করল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জবাব পেল সে। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখানে একটা শঙ্খচূড় সাপকে হিস্ স্ শব্দে ফণা আছড়াতে দেখল।

"সাপ!"

"হ্যাঁ, পালিয়ে চলুন।"

দুজনে পালাল, নিজেদের জায়গায় ফিরে গেল।

মাটিতে বসে ছেলেটি বলল, "মাথা ঠাণ্ডা করুন, কাঁদবেন না আর, আপনার ঐ মেয়েলি স্বভাবটা পালটান। জাহাজ এই দ্বীপের কাছ দিয়ে যায় না মনে হল, আবার কবে যে যাবে তাও জানি না। কিন্তু তাই বলে আশা ছাড়তে পারি না, সাপের বিষে মরতে পারি না। সুতরাং কাল থেকে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"কি করবেন?"

"তা কালই দেখবেন। যতদিন দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা না হয় ততদিন এই দ্বীপই আমাদের দেশ, এইখানেই আমাদের বাড়ী-ঘর।"

মেয়েটি ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। কোন জবাব দিল না সে, একটাও কথা বলল না; নানা রঙের মেঘে ঢাকা অন্তহীন আকাশের দিকে সে শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

দিন কাটতে থাকে।

ছেলেটি আর মেয়েটি মাছ ধরে, কাঠ কাটে, ফল পাড়ে, নারকেল কুড়োয়। পরস্পরকে সাহায্য করে তারা, সেবা করে। মাঝে মাঝে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। আশ্চর্য, সমস্ত শোক, দুঃখ ও দেশের বিরহের মধ্যেই একটা সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে। দুঃখই তাদের মধ্যবর্তী সেতু। ক্রমে তাদের কথাবার্তায় অন্তরঙ্গতা দেখা গেল। 'আপনি' বিদায় নিল, 'তুমি' এল। আর মাঝে মাঝে প্রকৃতি তাদের দুর্বল করে ফেলতে লাগল। মাঝে মাঝে ছেলেটির মনে হতে লাগল যে সে পুরুষ। মাঝে মাঝে মেয়েটির মনে হতে লাগল যে সে নারী।

ভাঙা তলোয়ার আর বর্শাফলকটা ধারালো করে তোলে ছেলেটি। তলোয়ার দিয়ে সে দাড়ি কামায়। তাই দিয়ে বাঁশ

কেটে সে ধনুক তৈরী করে, পাখী শিকার করে। তীরাহত শিকারকে সুসিদ্ধ করার জন্য পাত্র চাই। তাই সে মাটি দিয়ে গোলা তৈরী করে আগুনে পোড়ায়, মাটির হাড়ি আর বাসন তৈরী করে। বর্শা দিয়ে মাছ মারে সে, মৌমাছির চাক ভেঙ্গে মধু বের করে।

হঠাৎ রোদ আর হিম থেকে আত্মরক্ষার প্রশ্নটা ক্রমেই বড় হয়ে ওঠে।

মেয়েটা বলে, "তাহলে ?"

ছেলেটা বলে, "ভেবোনা, আমরা মানুষ।"

বাঁশ আর সুন্দরী গাছের ডাল কেটে নিয়ে এল ছেলেটি, মাঁচা তৈরী করে ঘর বাঁধতে শুরু করল। একটা তার, একটা মেয়েটির।

দিন কাটতে লাগল।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলায় ঝড় উঠল দ্বীপে।

ঠিক সন্ধ্যে হতেই একটা কষ্টিপাথরের মত কালো মেঘের স্তূপ পূবদিকের সমুদ্র থেকে যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, ক্রমে তা দ্রুতবেগে আকাশকে পরিব্যাপ্ত করে ফেল্‌ল। তারপর শোনা গেল মেঘের ডাক। সে ডাকে সমুদ্রের গভীর অতল থেকে সাড়া এল, কোথায় যেন একটা পাহাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে মনে হল। দ্বীপটা থরথর করে কেঁপে উঠল। মেঘের

ডাক আরো বাড়ল, সেই ক্রমবর্ধমান আহ্বান যেন সমুদ্রকে রোমাঞ্চিত ও উত্তেজিত করে তুলল। ফুলে ফেঁপে উঠল তা, তার ঢেউগুলো উঁচু হয়ে হয়ে ভেঙ্গে পড়তে লাগল দ্বীপের তটভূমিতে। তারপরেই হঠাৎ পূবদিক থেকে সেই ঝড় ছুটে এল। শোঁ শোঁ শব্দে তা সমুদ্রকে তোলপাড় করে দ্বীপের ওপরে এসে গাছে গাছে প্রতিহত হয়ে হিংস্রতায় ফেটে পড়ল। হরিণেরা পালাতে লাগল, পাখীরা আর্ত-কোলাহল তুলে ডানা ঝাপটাতে লাগল, শুক্‌নো পাতা আর ধূলোর জঞ্জালে দ্বীপটাকে যেন কুয়াশাবৃত বলে মনে হতে লাগল।

ছেলেটি কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখল যে মেয়েটি ভয়ে কাঁপছে।

কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, “কি হল? ভয় পেয়েছ?”

মেয়েটি হাসবার চেষ্টা করল, ছোট্ট একটি শিশুর মত মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ।”

ছেলেটি ঠাট্টা করল, “বাংলাদেশের মেয়ে হয়ে ঝড়কে ভয়?”

মেয়েটি তার শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, “কিন্তু এ তো ঝড় নয়, এ যে প্রলয়—”

ছেলেটি হেসে উঠল, বলল, “তোমাদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি —ভয় কি? দাঙ্গার মত মারাত্মক নয় এই প্রলয়।”

মেয়েটি হাসল।

ছেলেটি তাকাল। বাঁশের খুঁটি-পোঁতা তাদের অর্ধ-নির্মিত কুড়ে ঘরটা বাতাসের ধাক্কায় নড়ে নড়ে উঠছে।

সে বলল, "ঝড়টা কিন্তু সত্যি মুশ্‌কিলে ফেলল, আমাদের পাখীর বাসাটা হয়ত উড়ে যাবে—"

চোখ মেলে থাকা ক্রমেই দুষ্কর হয়ে উঠল। ঝড়ের বেগে ধুলো আর শুক্‌নো পাতা এসে চোখে মুখে ঝাপ্‌টা মারতে লাগল। তবু তাকাল তারা। দ্বীপটা যেন আর্তনাদ করছে। পাগলের মত মাথা দোলাচ্ছে নারকেল, সুপারী আর সুন্দরী গাছগুলো। দু-একটা গাছের ডালও ভেঙ্গে পড়ছে। ওপরে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশ, নীচে দ্বীপের চারদিকে কুটিল জল-রাশি। বায়ু-বিক্ষুব্ধ কালো সমুদ্র যেন ক্ষেপে গেছে, যেন লক্ষ লক্ষ অগ্নিশীর্ষ ফণা তুলে সহস্র-ফণা-যুক্ত অতিকায় নাগেরা গর্জাচ্ছে।

থেকে থেকে সমুদ্রের ভেতর থেকে একটা আদিম দৈত্য যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল, সবেগে ছুটে আসতে লাগল দ্বীপের দিকে, খাড়ির ভেতর দিয়ে ঠেলে, গাছপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তা ঝিলের কাছাকাছি এসে আবার ফিরে যেতে লাগল। দ্বীপটা যেন দুলে উঠতে লাগল। মেয়েটি হঠাৎ ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

ছেলেটি দ্রুত কণ্ঠে বলল, "চল টিলার দিকে পালাই—শিগ্‌গীর"—

মেয়েটি নড়ল না, ভয়ে তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এসেছে।

ছেলেটি তখন নিঃশব্দে তাকে কাঁধের ওপর তুলে ওপরের দিকে ছুটতে লাগল। আশ-পাশ দিয়ে সাপেরা চলে গেল, অগ্নিনেত্র শেয়ালেরা ছুটে গেল। ভ্রূক্ষেপ করল না সে। নিরাপদ একটা জায়গা চাই, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার এলাকাটা পেরিয়ে যেতে হবে।

ঝিলের ওপারে, একটু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গায় গিয়ে ছেলেটি থামল। মেয়েটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে সে বসল। তার সারা দেহ থেকে তখন ঘাম বেরোচ্ছে। ঘোর অন্ধকার। অন্ধকার আকাশ, অন্ধকার সমুদ্র, অন্ধকার দ্বীপ, অন্ধকারে সব কিছু অবলুপ্ত হয়ে গেছে। সেই ভয়াবহ অন্ধকারকে মেঘগর্জন, স্ফীতকায় সমুদ্রের শাসানি আর অরণ্যময় দ্বীপের আর্তনাদ যেন আরো ভয়াবহ করে তুলেছে।

ছেলেটি অনুভব করল যে মেয়েটি আবার তার পাশে এসেছে, তার গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে তার একটা হাত আঁকড়ে ধরেছে।

ছেলেটি সঙ্কুচিত হয়ে সরে যেতে চাইল, বলল, "এখনো ভয় করছে?"

মেয়েটির অস্পষ্ট জবাব এল, "হ্যাঁ, ভারী ভয় করছে, মনে হচ্ছে আর বুঝি বাঁচব না।"

ছেলেটি তিরস্কার করল, "ওকথা বলো না—ভয় জীবনের শত্রু।"

মেয়েটি আর কথা বলল না। কিন্তু তার দেহের কম্পনকে

অনুভব করে ছেলেটি বুঝল যে সে মোটেই আশ্বস্ত হয় নি। ক্রমেই মেয়েটি আরো নিবিড় হয়ে এল তার পাশে, ধীরে ধীরে তাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরল।

"ভয় পেয়ো না"—

"কিন্তু ভয় করছে যে—আমার কেউ নেই—আমার"—

ছেলেটি মেয়েটির পিঠে হাত বুলিয়ে প্রবোধ দিতে চাইল, বলল, "ভয় কি, আমি তোমার রক্ষী।"

মেয়েটি কেঁদে তার কাঁধে মাথা রাখল।

ঝড় সমান ভাবেই চলেছে তখন। সমুদ্রের সেই অতিকায় দৈত্য তখনো দ্বীপকে ধরে নাড়া দিচ্ছে।

ছেলেটি মেয়েটির ভীরু হৃদয়ের দ্রুত ওঠা-নামা টের পেল। আশ্চর্য একটা মমতায় তার হৃদয় ভরে উঠল। নির্জন দ্বীপে যে অনুভূতি মাঝে মাঝে তাকে শয়তান হয়ে মেয়েটির দিকে ইঙ্গিত করেছে আজ রাতের অন্ধকারে সেই অনুভূতির যেন মৃত্যু ঘটল। নতুন আর একটা অনুভূতি জন্মাল তার হৃদয়ে। দ্বীপের নির্জনতায় যে প্রথমে শত্রু, পরে বন্ধু হয়েছিল, সে যেন আজ প্রেয়সীতে রূপান্তরিত হল। তার পারাবতের মত ভীরু হৃদয়ের স্পন্দন, তার দেহসৌরভ, তার দুটি লতার মত হাতের আশ্রয়-পিপাসা সব যেন ছেলেটির হৃদয়ে এক পবিত্র আবেগের সৃষ্টি করল। সে মেয়েটিকে নিজের আরো সন্নিকটে আকর্ষণ করল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও তার বুকের ওপর মাথা লুকোল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। মুহূর্তের জন্য চোখোচোখী হল তাদের। যেন

তাদের শুভদৃষ্টি হল। বিদ্যুতের সেই প্রখর আলোতে যেন তারা পরস্পরকে এক লহমায় আবিষ্কার করল। প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা যেন মুহূর্তে সারা জীবনের জন্য দুশ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত হল। পরস্পরকে আলিঙ্গন করে তারা যেন এক হতে চাইল, দুটি সুর হতে চাইল একটি সুর। প্রত্যেকেই যেন অতীতের ক্ষতিকে পূরণ করে নিতে চাইল, পরস্পরের মধ্যে আশ্রয় খুঁজল। ছেলেটি হঠাৎ মেয়েটির ঠোঁটে চুমু এঁকে দিল। মেয়েটি শিহরিত আবেগে চোখ বুজল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ছেলেটি মেয়েটিকে ঠেলে দিতে গেল, বলল, "একি করলাম!"

মেয়েটি কম্পিত গলায় প্রশ্ন করল, "কি?"

"আমি অন্যায় করলাম।"

মেয়েটি তার দুটো বাহু দিয়ে ছেলেটিকে কঠিনভাবে বন্দী করল, দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "না।"

"না! আমি কি তোমার ভয় আর একাকীত্বের সুযোগ নিলাম না?"

"না। যদি তাই হত, তাহলে আমি তোমাকে ঠেলে ফেলে দিতাম।"

"কিন্তু আমরা যে আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ের মানুষ!"

"সম্প্রদায় চুলোয় যাক। এসো আমরা মানুষ হই"—

"আমি যে তোমার শত্রু!"

"তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ো না। আমাদের শত্রুতা ছিল

স্বার্থের পৃথিবীতে—এখানে স্বার্থ নেই—এখানে শুধু তোমার আমার পৃথিবী”—

“কিন্তু শোন”—

মেয়েটি কেঁদে উঠল, বিকৃত কণ্ঠে বলল, “না। আর কথা বলো না। তোমার কথাই ঠিক, মনুষ্যত্বই একমাত্র ধর্ম। দিনের পর দিন, এই দ্বীপের নির্জনতায় আমি যেন সত্যকে উপলব্ধি করেছি—দোহাই তোমার, তুমি হিংসার জগতকে পুনরুদ্ধার করো না। শোন, একথা ঠিক যে তুমি আমার শত্রু, কিন্তু উপায় কি? শত্রুর শত্রুতাকে ভুলবার যে চিরকাল একটিমাত্র পথ—ভালবাসা। শোন”—

ছেলেটি মেয়েটিকে যেন বুকের মধ্যে পিষে ফেলতে চাইল, আনন্দে রোমাঞ্চিত হল তার দেহ, কৃতজ্ঞতার আবেগে চোখে জল এল, অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে সে বলে উঠল, “শুনেছি, শুনেছি। তোমার শত্রুতাকেও আজ আমি ভালবাসা দিয়ে জয় করলাম”—

তারা ভালোবাসল। তাদের হৃদয় একটা পবিত্র অনুভূতিতে প্লাবিত হয়ে গেল। ভালবাসা সাহসের সঞ্চার করল। ঝড়, বিদ্যুৎ আর সমুদ্রগর্জন তুচ্ছ হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে সেই ঝড়ও থেমে এল। তাদের ভালবাসাতে প্রকৃতির বৈরিতাও যেন অন্তর্হিত হল। দ্বীপের বুকে একটা প্রশান্তি নেমে এল ধীরে ধীরে। ভয়ের নিঃশব্দ সমাধি থেকে জীবজগতের প্রাণ-চাঞ্চল্য আবার আত্মপ্রকাশ করল।

ছেলেটি ডাকল, “এই”—

মেয়েটি সাড়া দিল, "উঁ ?"

"কি বলে ডাকব তোমায় ?"

"তুমি বল।"

"তোমার নাম পাখী।"

"সুন্দর নাম—"

"আর আমার নাম তুমি বল।"

"তোমার নাম ? তোমার নাম বুলবুল।"

"আমাদের জাত ?"

"আমরা মানুষ।"

"ধর্ম ?"

"মনুষ্যত্ব।"

"পাখী, তুমি সুন্দর।"

"আর তুমি আমার চেয়েও সুন্দর।"

রাত এল, রাত গভীরতর হল। আধো আলো, আধো অন্ধকারের মাঝে পরস্পরের দিকে তারা মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে রইল। হাতে হাতে, বুকে বুকে, কেশে কেশে মিলেমিশে দুটি সুর এক হল। সমুদ্রের একটানা গর্জনে, গাছপালার মৃদু মর্মরে, কালো আকাশের জ্বলজ্বলে তারাতে তাদের প্রণয়গুঞ্জন, তাদের উষ্ণ শ্বাস আর কম্পিত আবেগ যেন সঞ্চারিত হল।

দ্বীপের পৃথিবী মধুময় হয়ে উঠল। ভালবাসা পৃথিবীকে মহৎ করে তুলল।

পরদিন থেকে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করল তারা। দুজনে এখন এক হয়েছে তারা। এখন তাদের অনেক কাজ। কবে সমুদ্রের বুকে একটা জাহাজ দেখা দেবে, কবে মোহনার জলে একটা নৌকো ভেসে আসবে তা কে জানে। তার জন্য বসে থাকলে তো চলবে না।

ঝিলের ওধারে, টিলার দিকটায় তারা কুঁড়েঘর তুলে ফেলল। বাঁশ আর মাটির দেয়ালের ওপর নারকেল পাতার ছাউনি।

সমুদ্রের জল থেকে লবণ বের করল তারা, নারকেল থেকে তেল আর মৌমাছির চাক থেকে মোমবাতি তৈরী করল।

ঝিলের মাছ, বুনো ফল আর নারকেল—এই খেয়ে তারা বাঁচতে লাগল।

কিন্তু বসে রইল না তারা।

ঝিলের উত্তর দিকে আগাছা আর গাছ কেটে জমি পরিষ্কার করল। শুকনো সুপারীর গাছ কেটে ডোঙ্গা তৈরী করে তারা সেই জমিতে জলসেচন করল। তারপর সেই কিছুদিন আগের দেখা ঘাসবন থেকে তারা ধানের চারা তুলে নিয়ে এসে রোপণ করল। আনন্দে পরিপূর্ণ হল হৃদয়, ভালবাসায় প্লাবিত হল চেতনা। সব কিছু সুন্দর মনে হল। আকাশ, দ্বীপ, সমুদ্র, গাছপালা, লতা, হরিণ, ঘাসের গুচ্ছ—স-ব। এবং তারা দেখল যে পৃথিবীর মধ্যে তারা, প্রাণরস রূপে পৃথিবীও তাদের মধ্যে। এই অনুভূতি তাদের দিব্যজ্ঞান দিল, দিব্যদৃষ্টি দিল। তখন তারা দেখল যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তারা দেখল যে মানুষই ঈশ্বর।

দিন কাটতে লাগল।

তাদের পরিধেয় ছিঁড়ে, গলে যেতে লাগল।

ক্ষেতে কাজ করতে ছেলেটি একদিন মেয়েটিকে ডাকল। কোন সাড়া এলনা।

"পাখী"—

তবু সাড়া এলনা। ব্যাপার কি ?

ছেলেটি তখন কুঁড়েতে ফিরে এল, দেখল যে মেয়েটি বসে আছে।

"কি হল, বাইরে যাচ্ছ না কেন ?"

"যেতে পারব না"—গায়ের গলিত বসন টেনে নিজেকে আবৃত করার বৃথা চেষ্টা করল মেয়েটি।

ছেলেটি বুঝতে পারল।

তুপুরবেলায় বর্শা আর তীর ধনুক নিয়ে সে খাড়ির পার্শ্ববর্তী একটা গাছে চড়ে বসে রইল। একটু বাদেই শুকনো পাতা দলে একপাল হরিণ এল তৃষ্ণা মেটাতে। তাদের দীর্ঘশৃঙ্গ, তাদের ডাগর ডাগর শান্তচক্ষু, তাদের চিত্রিত দেহের মসৃণতা ছেলেটিকে মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক করল কিন্তু পরমুহূর্তেই সে তীর ছুঁড়ল। একটি হরিণ লাফিয়ে উঠল, ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বর্শাটা ছুঁড়ে মারল, গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে মুমূর্ষু হরিণটাকে ধাওয়া করল।

হরিণটাকে নিয়ে বাড়ী ফিরল সে।

মেয়েটির চোখ ছল ছল করে উঠল, বলল, "একি করেছ তুমি ?"

ছেলেটি বলল, "প্রয়োজন মিটিয়েছি—মৃগচর্মের পোষাক তোমার লজ্জা হরণ করবে—"

মেয়েটি চোখের জল মুছে ফেলল, বলল, "মৃগচর্ম নয়, তুমি আমার লজ্জাহারী"—

ধানের চারা বড় হয়ে উঠল।

মানুষের ঘাম ঝরল দ্বীপের মাটিতে। ধানের শিষে পক্কতার লক্ষণ দেখা দিল। মানুষের ভালবাসা দ্বীপকে সুরভিত করল—পরস্পরকে ভালবেসে তারা দ্বীপকেও ভালবাসল।

এমনিভাবে চারমাস কেটে গেল।

ছেলেটি লক্ষ্য করতে লাগল যে মেয়েটির রূপ যেন দিন দিন বাড়ছে, আশ্চর্য্য এক সুকোমল লাবণ্য নামছে তার সারা দেহে। প্রস্ফুটিত পদ্মের মত, পাকা ফলের মত পরিপূর্ণতা লাভ করছে তার বিচিত্র যৌবন।

একদিন মাছ ধরতে যাবার জন্যে ছেলেটি মেয়েটিকে ডাকল।

মেয়েটি শুয়ে ছিল, মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বলল, "উঁহু, আমি আজ যেতে পারব না—"

"খাবে কি তাহলে ?" ছেলেটি তার হাত ধরে টানল, "ওঠো"

"না, আমি খাবো না"—মেয়েটি অলসকণ্ঠে বলল।

"বাঃ—কি হয়েছে তোমার ?"

মেয়েটির চোখের তারায় অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতা খেলে গেল, সে ছেলেটির মাথাটা নিজের মুখের ওপর টেনে আনল, তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলল।

ছেলেটি উজ্জ্বল মুখে তাকাল মেয়েটির দিকে, প্রশ্ন করল, "কবে ?"

মেয়েটি ছেলেটিকে ঠেলে দিল, কপট রোষে বলল, "তুমি দূর হও—"

ছেলেটি হো হো করে হেসে উঠল, মেয়েটির গালে একবার হাত বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। লাফিয়ে ঘরের বাইরে গেল সে, উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটতে লাগল। আনন্দ। তার আনন্দ এবার ফল হয়ে জন্মাবে। মানুষের রাজ্যে প্রজাবৃদ্ধি ঘটবে। দ্বীপের বুকে নতুন মানুষ আসছে। দুরন্ত উল্লাসে তার হৃদয়টা যেন পাখী হয়ে আকাশে উড়তে চাইল।

ঠিক পরদিন। দুপুরবেলা।

ছেলেটি আর মেয়েটির আনন্দ নতুন মানুষ হয়ে আসবার আগেই দ্বীপের ওপর মানুষের পদসঞ্চার হল।

ছেলেটি ধানক্ষেতে ছিল, মেয়েটি গিয়েছিল টিলার ওদিকে ফল সংগ্রহের জন্য।

ধানের শীষগুলো হাওয়ায় দুলছিল। মোহানার ওদিক থেকে আজকাল কয়েকটা শালিক উড়ে এসেছে দ্বীপে। তারা ধানক্ষেতের ছায়ায় উড়ে উড়ে বসছিল আর মাটির ওপর থেকে ঝরা ধানের শিষ কুড়োতে কুড়োতে কিচিরমিচির করছিল। ছেলেটি গুন্‌গুন্‌ করে একটা গানের কলি আওড়াচ্ছিল।

ঠিক সেই সময়ে মেয়েটি দৌড়ে এল।

"এই—এই শুনছ?" মেয়েটির কণ্ঠে উত্তেজনা।

ছেলেটি এগিয়ে গেল, সহাস্যে প্রশ্ন করল, "কি? পাখীর হল কি? মোহরের ঘড়া পেলে নাকি?"

মেয়েটি ঘর্মাক্ত ললাট থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে দ্রুতকণ্ঠে বলল, "মানুষ—মানুষ এসেছে দ্বীপে"—

ছেলেটির ভুঁরু কুঁচকে উঠল, মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, সে উচ্চারণ করল, "মানুষ!"

মেয়েটি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ"—

ছেলেটি বলল, "কেন? ওরা আবার আমাদের জ্বালাতে এল কেন?"

তার এই বিরূপ ভঙ্গীতে মেয়েটি অবাক হল, মৃদুকণ্ঠে বলল, "তাতে ক্ষতি কি? তুমি কি আর দেশে ফিরে যেতে চাও না?"

"দেশ!" ছেলেটি আত্মগতভাবে উচ্চারণ করল, দু'চোখ

দূরে মেলে যেন স্বপ্ন দেখল, তারপর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বলল, “হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিকই তো। চল, কোথায় মানুষ এসেছে দেখিগে”—

মেয়েটি বলল, “টিলার ওপর থেকে দেখলাম। দুটো বড় নৌকোতে জন দশেক লোক, আমাদের দু’-সম্প্রদায়েরই লোক—একসঙ্গে এসেছে।”

“বটে !”

“হ্যাঁ”—

ছেলেটির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, “দুই সম্প্রদায় একসঙ্গে ? পাশাপাশি ?”

“হ্যাঁ—”

“চল দেখি—”

কিন্তু কয়েক পা এগোবার পরেই তারা থমকে দাঁড়াল।

প্রায় একশ গজ দূরে। একদল মানুষ। সত্যি, দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি।

মেয়েটি একটা গাছের আড়ালে লুকোল, ছেলেটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সেই দলটি ছেলেটিকে দেখতে পেল, নিজেদের মধ্যে কি সব কথা বলতে বলতে তারা কাছে এসে পড়ল।

ছেলেটি দেখল তাদের। পাঁচজন করে দু’-সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের কয়েকজনের হাতে লাঠি আর দা’। দূরে-হারিয়ে-যাওয়া বাংলা দেশের মানুষ। অথচ মাস কয়েক আগেই

তারা পরস্পরের বুকে ছোরা নিক্ষেপ করেছিল। আজ তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাদের চোখে লোভ, কুটিলতা, জটিলতা। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকাল তাদের দিকে।

দশজন মানুষ তাকাল ছেলেটির দিকে। হরিণের চামড়া-পরা একটি যুবক, অনেকটা বাঙালীর মত দেখতে।

ভয়ংকর মোটা, বছর পঁয়তাল্লিশের একজন লোক এগিয়ে এল কাছে, একগাল হেসে, ময়লা দাঁত বের করে বলল, "তুমি কে ভাই? বাঙালী?"

ছেলেটি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"এখানে এলে কি করে?"

"এখানেই থাকি আমি।"

"তাহলে তোমার বাপদাদারাও এখানে?"

"হ্যাঁ"—

"হুঁ"—

মোটা লোকটির সমবয়সী একজন লম্বা, লিকলিকে, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ এগিয়ে এল কাছে, তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে ছেলেটিকে পর্যবেক্ষণ করে বলল, "তুমি কোন সম্প্রদায়ের লোক?"

ছেলেটি ঝকঝকে দাঁত মেলে হাসল, বলল, "আমি মানুষ —জংলী মানুষ।"

নাক-বসা একটি বেঁটে কালো লোক প্রশ্ন করল, "বাঁ-তুঁমি কিঁ ঈঁশ্বর মাঁনো নাঁ?"

"মানি।"

"কিভাবে ?"

"আমার মধ্যেই ঈশ্বর আছে।"

মোটা লোকটি বলল, "তুমি নাস্তিক।"

লিক্‌লিকে লোকটি বলল, "তুমি বিধর্মী !"—

ছেলেটি বিনীত হেসে বলল, "আমি মানুষ।"

বাঁ-চোখ-কানা একজন অসুরাকৃতি মুসলমান নাক-বসা লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে কাছে এল, বলল, "চুলোয় যাক্ ওসব কথা—এই দ্বীপে আর কে থাকে বলত ?"

"আর কেউ না।"

সবার মুখে আশ্বস্ত একটা ভাব নেমে এল। যেন তারা একটা দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচল।

"এই দ্বীপটাতে তা হলে মানুষ-জন বাস করতে পারে ?" তামাটে রংয়ের একজন হিন্দু জিজ্ঞেস করল। তার গলা ভাঙা, বোধ হয় গাঁজা খায় সে।

ছেলেটি বলল, "আমি তো করছি।"

বছর বাইশের ভীরু-মুখ হিন্দু যুবকটি হঠাৎ একদিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "বাপ্!"

"কি হল র‍্যা তারক ?" কানা-মুসলমানটি প্রশ্ন করল।

"সাপ !"

তোৎলা লোকটি হেসে উঠল, "পা-পা-প্পালা—ভী-ভী-ভীতু কোথাকার—"

সবাই হেসে উঠল হো হো করে।

নাকবসা লোকটি ছেলেটিকে আবার প্রশ্ন করল, "ওঁহে ভাঁয়া —তোঁমার নাঁম কিঁ ?"

"বুলবুল।"

"সাঁবাস্—বেঁড়ে নাঁম—তাঁ তোঁমার আঁর কেঁ আঁছে এঁখাঁনে ?"

"আমার বৌ।"

কানা লোকটি দাঁত মেলে হাসল, অপর চোখটি টিপে বলল, "বটে! সে কোথায় ?"

"এই যে"—ছুজনের গলা শোনা গেল।

সবাই ঘুরে তাকাল। চব্বিশ বছরের একটি কালো জোয়ান মুসলমান ছোক্‌রা আর একটি বেঁটে খাটো ফরসা হিন্দু ছোকরা একটা গাছের পেছন থেকে বলল। সবাই এগিয়ে গেল সেদিকে।

ছেলেটির চোখ জ্বলে উঠল, তাড়াতাড়ি গিয়ে সে মেয়েটির পাশে দাঁড়াল।

মেয়েটির ছু'চোখে চকিত দৃষ্টি, আর লজ্জা। কৌতূহলবশে মুখটা বাড়িয়ে লোকগুলোকে দেখতে গিয়েই সে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সবাই তাকাল। মেয়েটির কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত আর বুকটা হরিণের চামড়ায় ঢাকা, তার হাতে ছু'গাছি করে কাঁচের আর ছু'গাছা করে সোনার চুড়ী, গলায় সরু চেনহার, কানে ছুল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং, তার অনাবৃত হাতের [redacted] নিম্নভাগ কি অদ্ভুত মসৃণ! আর মৃগচর্ম্মের বক্ষাবরণের ওপরকার

উপত্যকাপ্রদেশ! আলুলায়িত কোঁকড়ানো চুলের গোছা কাঁধ ছাপিয়ে, পিঠ ছাপিয়ে কোমর পর্য্যন্ত নেমেছে। লোকগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল।

সেই জোয়ান মুসলমান ছোকরা অদ্ভুত একটা শিষ দিল। বেঁটে হিন্দু ছোকরা তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

মুসলমান ছোকরা নিম্নকণ্ঠে বলল, "দ্বীপের হুরী!"

হিন্দু ছোকরা চাপাগলায় বলল, "আমি আর ফিরছি না দেশে, মাইরি বলছি"—

ছেলেটি সবার চোখে লালসার ছায়া দেখতে পেল। সে কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "তোমরা কারা? এখানে কি চাও?"

মোটা বয়স্ক হিন্দুটি বলল, "আমরা একদল বন্ধু—"

লিকলিকে মুসলমানটি বলল, "আমরা এই দ্বীপে বসবাস করব।"

ছেলেটি উত্তেজিতকণ্ঠে 'বলল, "কেন?" এখানে থাকবেন কেন আপনারা?"

মোটা হিন্দুটি হাসল, "কেন নয়? এটা কি তোমার কেনা জায়গা?"

লিকলিকে মুসলমানটি কাছে এসে ছেলেটির কাঁধে হাত রাখল, মোলায়েম গলায় মৃদু হেসে বলল, "তুমি আমাদের ভয় করো না ভাই। এই দ্বীপের মাটি ভালো, আমরা সবাই থাকতে পারব এখানে। আমরা নতুন এসেছি—আমাদের তোমরা সাহায্য করো, কেমন?"

ছেলেটি সবার দিকে তাকাল, কি যেন ভাবল, তারপর বলল, "আচ্ছা।"

তোৎলা লোকটি বলল, "ধা-ধা-ধান দেখতে পা-পা-প্পাচ্ছি। তুমি চা-চা-চ্চাষ দিয়েছ বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

কানা লোকটি বলল, "তা হলে ধানচাল আছে তোমার এখানে ?"

"না—ফুরিয়ে গেছে।"

লিকলিকে লোকটি বলল, "ভেবো না কিছু—আমাদের কাছে বিশ মণ চাল আছে, আমরা তৈরি হয়েই বেরিয়েছি দেশ থেকে—তোমার দরকার হলে চাট্টি নিও।"

মুসলমান ছোকরাটি বলে উঠল, "নিশ্চয়ই আবদুল চাচা—নিশ্চয়।"

হিন্দু ছোকরা হেসে বলল, "আমিই চাল নিয়ে আসব'খন—কেমন ?"

ছেলেটির কৌতূহল হল, সে প্রশ্ন করল, "দেশের হালচাল কি বলুন তো ?"

মোটা হিন্দুটি বলল, "সব ঠিক আছে"—

"দাঙ্গা ?"

"সে কবে মিটে গেছে। দেশে বড় ভিড়—খেতে পরতে পাচ্ছে না লোকে—তাই আমরা নতুন জায়গাতে বসবাস করার জন্য বেরিয়েছি।"

"ওঃ"—

লিকলিকে লোকটি এবার সবার দিকে তাকাল, বলল, "যাক্, এবার সবাই ফিরে চল নৌকোয়—কাল থেকে এখানে আমরা কাজ শুরু করব।"

মোটা হিন্দুটি সায় দিল।

হিন্দু ছোকরাটি হেসে বলল, "আমি আর জাহাঙ্গীর এদিকটা একটু বেড়িয়ে আসি চাচা, এঁ্যা?"

লিকলিকে লোকটি মাথা নাড়ল, "না," পরে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের সঙ্গে তোমার আলাপ হওয়া দরকার —একই জায়গায় যখন থাকব আমরা, বুঝলে না!"

ছেলেটি নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল লোকটী। তার নাম আবদুল। মোটা হিন্দুটির নাম হরিপদ। কানা মুসলমানটির নাম গফুর। নিঃশব্দ একটি ত্রিশ বছরের নিরীহ মুসলমান, তার নাম কলিম। মুসলমান ছোকরার নাম জাহাঙ্গীর, হিন্দু ছোকরার নাম নকুল। গাঁজাখোরটি কার্তিক। ভীরু হিন্দু ছোকরার নাম তারক। তোৎলা লোকটি ডুকড়ি আর নাক-বসা লোকটি এনায়েৎ।

সবার নাম জেনে ছেলেটি প্রশ্ন করল, "আপনারা দেশে ফিরে যাবেন না!"

হরিপদ মাথা নাড়ল, "তা কি আর যাব না—মাস খানেক পরেই তিন-চার জন যাবে দেশে আর কিছু জিনিস-পত্তর

আনতে। বেশি দূরে নয় আমাদের দেশ, পঁচিশ মাইল—তবে রাস্তাটা বড় খারাপ। ওস্তাদ না হলে নৌকো চালানো যায় না। কিন্তু কেন, তোমরা যাবে নাকি ওদিকে !"

ছেলেটি মাথা নাড়ল, "না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।"

সবাই চলে গেল। যাবার সময় জাহাঙ্গীর নকুলকে চিম্‌টি কাটল। দুজনে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল। তা দেখে মেয়েটি দু'হাতে মুখ ঢাকল।

সবাই চলে গেল।

মেয়েটি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "লোকগুলো ভালো নয়।"

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু উপায় কি !"

"চল, পালিয়ে যাই ওদের একটা নৌকা নিয়ে।"

ছেলেটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, "রাস্তা ঘাট চিনি না, মোহানার স্রোত বড় বিপজ্জনক—দু'জনে যাই কি করে ! তার চেয়ে সবুর করো, একমাস বাদে ওদের সঙ্গেই যাব।"

মেয়েটি কথা বলল না। কি আর হবে প্রতিবাদ করে ? উপায় কি তা ছাড়া ? কিন্তু তার যে আর তর সইছে না। মোহানার জল পেরিয়ে, দিগন্তের ওদিককার বহুদূরবর্তী দেশের ডাক যে তার কানে এসে পৌঁছোচ্ছে, তার অন্তরকে ব্যাকুল করে তুলছে। দ্বীপের দিকে তাকাল সে। সুন্দর দ্বীপটা। ছবির মত। তার ভালবাসার দ্বীপ। অথচ এই দ্বীপ ছেড়ে যেতে হবে ! ভাবতে গিয়ে মমতায় বুক দুলে ওঠে। কিন্তু উপায় কি ! দেশের চেয়ে কি তা বড় !

ছেলেটিও চুপ করে থাকে। ভাবে। বহু মানুষের পদ-সঞ্চারের সঙ্গে হিংসার জগৎটাও দ্বীপের মধ্যে এসেছে। এসেছে লোভ, লালসা, জটিলতা। সাবধান, সাবধান!

পরদিন দ্বীপের বুকে আলোড়ন জাগল।

নৌকো দুটোতে পাহারা দেওয়া আর রান্না করার জন্য রইল কলিম আর তারক। বাকি আটজন লোক এসে দ্বীপকে তোলপাড় করে ঘুরে বেড়াল। তাদের সঙ্গে শাবল, কোদাল, দা, লাঠি, হুঁকো, কলকে আর বদ্‌না ঘটি।

ঝিলের যেদিকে ছেলেটি আর মেয়েটি কুঁড়ে ঘর বেঁধেছে, তার বিপরীত দিকে খাড়িটার কাছাকাছি লোকগুলো একটা বড় কুঁড়ে ঘর তৈরি করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। বাঁশ আর হোগ্‌লা কাটল তারা, জঙ্গল সাফ করল, মাটি কুপিয়ে ভিটে করল। তিনদিন তিনরাত খেটে তারা কুঁড়ে ঘর দাঁড় করাল। তারপর নৌকো দুটোকে ডাঙায় টেনে তুলে ভারি নোঙরের সঙ্গে তালা দিয়ে বেঁধে জিনিস-পত্র নিয়ে এসে নতুন আস্তানায় হাজির হল। সর্বশেষে সুরু হল ক্ষেত চাষ দেওয়া। লাঙল আনেনি তারা, কোদাল আর শাবল দিয়েই তারা জমির চেহারা পালটে ফেলল।

তিন দিনে দ্বীপের চেহারাও যেন পালটে গেল। ছেলেটি আর মেয়েটির বুক মাঝে মাঝে শংকায় কেঁপে ওঠে। হরিণেরা

মানুষের গন্ধ পেয়েছে, নির্ভয়ে তারা আর জল খেতে আসে না। তারা ঘাট বদলাল। বিষাক্ত সাপেরাও যত্র-তত্র নির্ভয়ে বিচরণ করা বন্ধ করল, শেয়ালেরা টিলার দিককার ঘন জঙ্গলে আশ্রয় নিল, পাখীরা বাসা বদল করল। দ্বীপের মাটিতে বহু মানুষের পায়ের দাগ পড়ল।

শুধু আকাশ, সমুদ্র আর মোহানার জলের চেহারা এক রইল। বাতাস একইভাবে দ্বীপের বুকে আসা-যাওয়া করতে লাগল। সূর্য উদিত হল, অস্তে গেল। চাঁদ উঠল, ডুবল। রাতের আকাশে তারারা কাঁপতে লাগল, তার নীচে সমুদ্র গর্জাতে লাগল আর তরংগ-শীর্ষে বাড়বানল জ্বলতে লাগল।

ছেলেটি আর মেয়েটি সভয়ে দেখতে লাগল মানুষ এসেছে দ্বীপে কিন্তু তাদের চোখে কল্যাণের স্বপ্ন নেই। অস্বস্তিতে দিন কাটতে লাগল তাদের।

ইতিমধ্যে জাহাঙ্গীর আর নকুল এসে একদিন প্রচুর চাল দিয়ে গিয়েছিল। সেই চালে দিন পনেরো চলে যাবে। চাল নিয়ে কেঁদেছিল তারা, বহুদিন বাদে তারা অন্নের সুঘ্রাণ পেয়েছিল, স্বাদগ্রহণ করেছিল, প্রতিটি গ্রাসের সঙ্গে তাদের দেহে উৎসবের আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু পরে অনুতাপ করেছিল তারা, কারণ তারপর থেকেই যখন তখন আসতে লাগল জাহাঙ্গীর আর নকুল। তাদের চোখে লালসার অগ্নি শিখা।

শুধু তারা নয়। সময়ে-অসময়ে, কারণে-অকারণে সবাই

আসতে লাগল তাদের কুঁড়েতে। তাদের সমাহিত, প্রেমমুগ্ধ, শান্ত জীবনের বুকে লোকগুলো ঝড় নিয়ে এল।

আজকাল মেয়েটি আর বাইরে বেরোয় না। ছেলেটিও বেশি দূরে যায় না। রাতের বেলা ভাঙা তলোয়ারটা পাশে রেখে সে অর্ধ জাগ্রত হয়ে থাকে। বিশ্বাস নেই, দ্বীপের বুকে লোভী মানুষেরা এসেছে।

মাঝে মাঝে মেয়েটি সভয়ে ভয়ে বলে, "শুনছ—এই ?"

"কি !"

"আমার আর একদণ্ডও ভালো লাগছে না—কবে যাবে ?"

"যাবো—যাবো।" ছেলেটি ক্লান্তকণ্ঠে বলে। তার অহমিকায় ঘা লাগে। তার মনুষ্যত্বে আঘাত লাগে। মানুষের ভয়ে আবার পালাতে হবে ! কেন ? মানুষ কি জানোয়ার ?

সেদিন সকালে।

ছেলেটি গিয়েছিল কাঠ কুড়োতে, মেয়েটি রান্নার উদ্যোগ করছিল।

হঠাৎ চমকে উঠল সে।

দরজার গোড়ায় চারজন লোক। জাহাঙ্গীর, এনায়েৎ, নকুল আর দুকড়ি।

সন্ত্রস্ত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল সে।

নকুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে হাসল, বলল, "লজ্জা কি পাখী—বোস, বোস। তারপর তোমার মরদটি কোথায়?"

মেয়েটি কঠিনকণ্ঠে বলল, "জঙ্গলে।"

"তা বেশ, তা হলে একটু বসি—"

"কি দরকার!"

জাহাঙ্গীর হাসল, "কি আবার, এই একটু গল্প করব—"

তুকড়ি হুঁকো কলকে তুলে ধরল, বলল, "এট্টু আগুন হ-হ-হ-হ-বে নাকি গো ম্-ম্মেয়ে!"

মেয়েটি নিঃশব্দে উনুন থেকে একটু আগুন তুলে দিল কলকের ওপর।

এনায়েৎ তুকড়িকে কনুয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, "আঁমাকেঁও একটান দিঁস ভাই—" লুব্ধ দৃষ্টি মেলে সে মেয়েটির দিকে তাঁকিয়ে রইল।

জাহাঙ্গীরের দৃষ্টিতেও যেন একটা অজগর সাপ। পলকহীন। সে দাঁত বের করে ক্লেদাক্ত হাসি হাসল, বলল, "এক ভাঁড় জল দেবে মাইরি!"

মেয়েটির মুখচোখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। লজ্জায়, রাগে। তবু সে এক ভাঁড় জল এনে দিল জাহাঙ্গীরকে। জাহাঙ্গীর সেই জল নিতে গিয়ে মেয়েটির হাত চেপে ধরল।

নকুল তা লক্ষ্য করল, তাড়াতাড়ি সেও মেয়েটির হাত চেপে ধরে সহাস্যে বললে, "আমাকেও একটু জল দাও পাখী—"

মেয়েটি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিল, কটমট করে তাকালে সবার দিকে।

হঠাৎ এনায়েৎ কি যেন ভাবল, প্রশ্ন করল, "ওঁ মেয়ে, তুমি কিঁ আঁগে রঁসুলপুরে থাঁক্‌তে?"

মেয়েটি চমকে উঠল, তীব্রকণ্ঠে বলল, "না।—" বলেই সে সবেগে বাইরে ছুটে পালাল।

জাহাঙ্গীর হেসে উঠল।

নকুল বলল, "তোর শালার বড় বাড়াবাড়ি—একটু ভড়কে গেছে—"

"তা তো হবেই—জংলী যে—"

এনায়েৎ জাহাঙ্গীরের কাঁধে হাত রাখল, "এঁই—"

"কি?"

"মেয়েটির মুখটা যেঁন চেঁনা চেঁনা ঠেঁকল—রসুলপুরের রহমান মিঞার বেঁটির মত—"

"ধ্যেৎ"—জাহাঙ্গীর মুখ ভেংচাল, "ভালো চেহারা তোমার বেশ তো ঠেকবেই। কিন্তু বেশি আশা করো না মিঞা—তোমার কপালে ও সইবে না। বদমাইশি করে নাক খুইয়েছ, হাড় পাকিয়েছ, আর কেন?"

এনায়েৎ হুঁকো টানতে টানতে হাসল। জাহাঙ্গীর রসিকতা করুক, কিছু আসে যায় না। ছোকরার নবীন বয়েস, ঠাট্টা ইয়ার্কি করবে বই-কি। কিন্তু মেয়েটা যেন চেনা। হ্যাঁ, আবদুল মিঞাকে জানাতে হবে—মেয়েটাকে মুসলমান বলেই মনে হচ্ছে।

ছেলেটি ফিরে আসছিল। রাস্তায় দেখা হল হরিপদ আর কার্তিকের সঙ্গে।

হরিপদ হাসল, "কোথায় গেছলে হে ?"

ছেলেটি কাঠের বোঝা তুলে দেখাল।

হরিপদ বলল, "ঝিলে মাছ আছে খুব, না বুলবুল ?"

"হ্যাঁ—"

"আজ জাল ফেলব আমরা।"

"বেশ তো—"

কার্তিক হঠাৎ এগিয়ে এল কাছে, চোখ দুটো ছোট ছোট করে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, তুমি কি কখনো গোপালপুরে গিয়েছিলে ?"

ছেলেটি তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকাল, মাথা নেড়ে সে দ্রুতকণ্ঠে বলল, "না।"

কার্তিক নজর ফেরালো না, হেসে বলল, "তবে হয়ত আমি শালার চোখেরই ভুল—"

হরিপদ হাসল, "তাই হবে—তুই হারামজাদা কি আর কখনো সাদা চোখে দুনিয়া দেখিস্ ? হাঃ হাঃ হাঃ—"

"যাই"—ছেলেটি বলল।

"আচ্ছা—আচ্ছা—"

কার্তিক তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল, বলল, "শালা নিশ্চয় হিন্দু—"

হরিপদ ঘুরে তাকাল, "কি বলছিস্ রে মুখপোড়া ?"

"ঠিক বলছি। শালাকে দেখেছি কোথাও—শালা নির্ঘাৎ হিন্দু"—হরিপদর চোখ ছোট হয়ে এল, একটু ভেবে সে বলল, "না হলেই বা—ব্যাটাদের হিন্দু করে নেব আমরা। বুঝলি না, এই দ্বীপে হিন্দুর সংখ্যাটা বেশী হলে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।"

"তা ঠিক।"—

"সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে পটাবো'খন—মাথা মুড়িয়ে একশো আটবার মা কালীর নাম নিলেই তো হল—"

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় হাসল কার্তিক, "আর মেয়েটা! আহা, কি ফাইন চুল ছুঁড়ীর—"

"চুপ কর্ হারামজাদা—বজ্জাতি করিস্ নে—বুঝলি, ও চিজ আমার, ওর ওপর নজর দিস্না—খবরদার—"

"হ্যা হ্যা হ্যা"—ফ্যাঁসফেঁসে গলায় কার্তিক আরো জোরে হাসল।

এনায়েতের সন্দেহের কথা আবদুল শুনল। শুনে তার চোখ দুটো সাপের চোখের মত জ্বলতে লাগল। বসে বসে অনেকক্ষণ ভাবল সে, তারপর উঠল।

মুসলমান সঙ্গীদের আড়ালে ডেকে নিয়ে সে বলল, "বুঝলে ভাই সব, হিন্দুদের সাথে লড়াই নাই এখন আমাদের। কিন্তু ব্যাপার কি জানো! তৈরি থাকতে হবে—কখন কি হবে কে

জানে? তা ছাড়া যেখানেই যাও, যাই করো, সব সময়েই খোদার বান্দাদের সংখ্যা বাড়াবে। ধর্ম এবং জাতকে বাঁচিয়ে রাখার এই একমাত্র পথ। ঐ জংলী ছোকরা আর ছোক্‌রীকে আমাদের মুসলমান করতে হবে, বুঝলে? এটা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। যদি না করো তাহলে হয়ত ওরা হিঁদু হয়ে যেতে পারে—তখন কি হবে বুঝতে পারছ?

সবাই মাথা নাড়ল, সবাই সমর্থন করে বলল, "নিশ্চয় চাচা—তোমার কথা বিলকুল ঠিক, পাগল হয়েছ চাচা—ওদের আমরা কখনো হিঁদু হতে দেব না—"

ক্ষেতের কাজ করতে করতে বেলা হয়ে গিয়েছিল বলে চান করার সময় পেলনা কেউ, সোজা গিয়ে খেতে বসল।

খাবার বেলা সেই সনাতন জাতিভেদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—দুই সম্প্রদায় পৃথক পৃথক খেতে বসল।

আহার-পর্ব শেষ হল। বিশ্রাম করতে লাগল সবাই।

একটু বাদে হরিপদ উঠল, বলল, "যাই, এট্টু বেড়িয়ে আসি—"

বেরিয়ে গেল সে।

খানিকবাদে এটা ওটার ছুতো করে কার্তিক, নকুল, তারক আর দু'কড়িও সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে গিয়ে তারা হরিপদকে অনুসরণ করল।

কিছুক্ষণ বাদে হুঁস হল আবদুল মিঞার, সে গফুরকে প্রশ্ন করল, "হরিপদরা কোথায় গেল রে?"

"জানি না।"

এনায়েৎ বলল, "ওঁই ছোঁড়া-ছুঁড়ীর ওঁখানে গেঁল না তোঁ? ওঁরাও হঁয়তোঁ—"

আবদুলের লিকলিকে দেহটা সুতানলী সাপের মত খাড়া হয়ে উঠল। সে কুটিল চোখে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক—ওরাও হয়ত আমাদের মত মৎলব করেছে। দেখছিস্ না! সবগুলো হিঁদুই গেছে—শিগ্গীর চল দেখি—"

সবাই লাফিয়ে বাইরে বেরোল।

পা টিপে টিপে সবাই ছেলেটির আস্তানার দিকে গেল। কিন্তু সামনের দিক দিয়ে গেল না তারা। ঘুরে কুঁড়েটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

ভেতরে কথাবার্তার আওয়াজ পেল তারা, কান পেতে শুনল। তাদের অনুমান সত্যি। কুঁড়ের ভেতরেই রয়েছে হরিপদরা।

তাদের অনুমান আরো সত্যি।

তারা হরিপদর চাপা গলা শুনতে পেল।

"কি! তা হলে হিন্দু হবে না তোমরা!"

"না," ছেলেটির দৃঢ়কণ্ঠ ভেসে এল।

হরিপদ বলল, "কিন্তু তুমি তো হিন্দুই ভায়া—"

"আপনি জোর দিয়ে বললেই কি তা সত্যি হবে?"

"হুঁ—তা হলে হবে না হিন্দু?"

"প্রয়োজন দেখি না।"

"ঈশ্বরহীন থাকবে!"

"ঈশ্বরকে আমি পেয়েছি।"

"ভেবে দেখো, চট্ করে 'না' করো না। শোন, আমরা এখন যাচ্ছি, নইলে আবদুল মিঞা হয়ত আবার সন্দেহ করবে। কিন্তু কাল আবার আসব আমরা।"

হরিপদদের পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। আবদুলের মুখে বিচিত্র হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সবাইকে ইঙ্গিতে সে অগ্রসর হতে বলল।

তাদের দেখে ছেলেটি আর মেয়েটির মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। জাহাঙ্গীর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

আবদুল মিঞা বলল, "তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে এলাম বুলবুল।"

ছেলেটি শুষ্ক হেসে বলল, "হঠাৎ কি ব্যাপার?"

"এক্ষুনি বুঝি হরিপদরা এসেছিল!"

"হ্যাঁ।"

"কি গল্প হচ্ছিল?"

"আমাকে তারা হিন্দু হতে বলছিল—"

"তোমরা রাজী!"

"না—"

গভীর তৃপ্তিতে মাথা নাড়ল আবদুল, নিজের কাঁচাপাকা

দাড়িতে হাত বুলিয়ে সে অন্তরঙ্গভাবে বলল, "সাবাস্। সত্যি তো, কেন হিন্দু হবে তোমরা! ছিঃ—শোন ভাই—"

"বলুন—"

"একটা আরজি আছে আমার, মানলে তোমার লাভ হবে।"

"কি!"

"তোমরা মুসলমান হও, খোদার বান্দা হয়ে জীবনকে ধন্য কর।"

"খোদাকে আমি পেয়েছি মিঞাসাহেব, আমার মুসলমান হবার দরকার নেই।"

"আহা-হা, চটো কেন! একটা কিছু যখন হতেই হবে তোমাকে, তখন ছুনিয়ার সেরা জীব মুসলমানই হও না কেন?"

"আমি মানুষ হতে চাই, হিন্দু কিংবা মুসলমান হতে চাই না।"

"আহা শোন—"

প্রত্যেকেই চেষ্টা করল। বারংবার। কিন্তু ছেলেটির একটি কথা: না।

তবু আবছুল হাল ছাড়ল না, সহাস্যে বলল, "আচ্ছা পরে আসব ভাই। একদিনে বুঝবে না তুমি—তোমায় আরো বোঝাব।"

সবাই চলে যেতেই ছেলেটি ফেটে পড়ল, "শয়তান—ওরা শয়তান—"

মেয়েটি এসে তার হাত চেপে ধরল, বলল, "চল পালাই -- "

ছেলেটি যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল, "পালাব? কেন! এই দ্বীপ কি ওদের কেনা? আমরা কি ওদের কেনা? যখন যাবার হবে যাবো—পালাবো কেন?"

"কিন্তু আমার যে ভয় করছে—"

মেয়েটিকে বুকে টেনে নিয়ে ছেলেটি অভয় দিল, বলল, "ভয় কি! আমি আছি।"

হঠাৎ দোরগড়ায় একটা মাথা উঁকি দিল।

"কে!" মেয়েটিকে সরিয়ে দিয়ে ছেলেটি চেঁচাল।

"আমি—" ছু'কড়ি একগাল হেসে সামনে এসে দাঁড়াল।

"আবার কি চাই?"

গলার সুর নামিয়ে ছু'কড়ি প্রশ্ন করল, "নে-নে-ম্নেড়েগুলো এখানে এ-এ এয়েছিল, তা-তা-তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"ক-ক্-ক্-ক্যানো? তোমাদের মু-মু-স্মুঃ-স্মুঃ-সলমান হতে বলছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"হ-হ্-হ-অ-বে নাকি?"

ছেলেটি গর্জে উঠল, "না-না-না—"

ছু'কড়ি হেসে বলল, "তা-তা-ত্তাই বলো"—বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকাল দুজনে। বাইরে হাওয়া

বইছে। নারিকেল-সুপারী বন মর্মর-ধ্বনিতে মুখর। দূরে, কোথায় যেন ঘুঘু ডাকছে। শালিকেরা ক্ষেতের বুকে কিচির-মিচির করে ধান খুঁটে খাচ্ছে। বাতাসে বুনো ফুলের সুবাস। অপরাহ্নের আকাশে পা দিয়েছে সূর্য। তার আলোতে আসন্ন শরতের সোনালী স্বপ্ন। ঠিক দেশের মত। আর একটানা গর্জাচ্ছে সমুদ্রটা। সুন্দর দ্বীপ। তাদের দ্বীপ। সেই দ্বীপে আজ মানুষের ছদ্মবেশে পাপ এসেছে!

"পাখী—"

"উঁ?"

"যাবো—একদিন যেতেই হবে—"

"চল চল—"

"কিন্তু দ্বীপটা বড় সুন্দর, বড় মায়াময়—"

"হ্যাঁ।"

"এই দ্বীপেই আমি তোমাকে পেয়েছি—তোমার মধ্যে নতুন দ্বীপকে আবিষ্কার করেছি—"

"আর তুমি? এখানে তো আমিও তোমাকে পেয়েছি, আমাদের এই দ্বীপের মধ্যে—আমারো দ্বীপ যে তুমি—"

"যাবো—যাবো পাখী—তা নইলে হয়ত বিপদ হবে। হ্যাঁ, এখানে আর বেশীদিন হয়ত থাকতে পারব না—দ্বীপের ওপর শয়তানের নজর পড়েছে।"

সেদিন বিকেলে একটা কাণ্ড হল।

দুপুরে কেউ চান করার সময় পায় নি, তাই বিকেল হতেই চান করার ইচ্ছে হল আবদুলদের।

জাহাঙ্গীর প্রস্তাব করল, "চল খাড়িতে গিয়ে সমুদ্রের জলে চান করিগে—"

নকুল ঠাট্টা করল, "নোনা জলে চান করবি রে শালা?"

"হ্যাঁ রে সুমুন্দি—"

দু'কড়ি বলল, "ম-ম-মন্দ বল নি ভা-ভা-ভা—"

জাহাঙ্গীর বাধা দিয়ে বলল, "থাক, আর বলতে হবে না, বুঝেছি—"

আবদুল মৃদু হেসে বলল, "ঠিক আছে— চল যাই—"

কাণ্ডটা ঘটল চান করতে গিয়ে।

নকুল ডানপিটে ছোকরা। জলের মধ্যে ডুব দিয়ে সে নানা কসরৎ দেখাতে শুরু করল। হঠাৎ একবার একটা ডুব দিয়ে সে আর জলের তলা থেকে ওঠেই না।

সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

জাহাঙ্গীর গালিবর্ষণ করে উঠল, "শালা লুচ্চা এবার মরল বুঝি—"

হরিপদ ভীত হয়ে বলল, "আহাহা—একবার খুঁজে দেখ্ ভাই—"

ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ভুস্ করে ভেসে উঠল নকুল, এক মুখ জল ছুঁড়ে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে তীরের ওপর উঠে হাত মেলে দেখাল। তার দু'হাতে দুটো মস্ত বড় ঝিনুক।

জাহাঙ্গীর খিস্তি করে বলল, "জলের ভেতরে কি করছিলি রে শালা ?"

নকুল বলল, "তলায় কি আছে দেখতে গেলাম—দেখলাম ঝিনুক, ভাবলাম তুলে নিই ওটাকে—"

"কেন ? ও দিয়ে কি হবে ? খাবি ?"

"খাব মানে ? এর ভেতর মুক্তোও তো থাকতে পারে—" নকুল হাসল।

আবদুলের চোখ জ্বলে উঠল, "দেখ্ তো —দেখ্ তো—"

একটা ঝিনুক ভাঙ্গল নকুল। সবাই হেসে উঠল। কিচ্ছু নেই তাতে।

"দূর শালা—" জলের মধ্যে সেটাকে ছুঁড়ে মারল নকুল।

দ্বিতীয় ঝিনুকটাকে ভাঙল নকুল।

হঠাৎ সবাই উত্তেজনায় ফেটে পড়ল, "দেখি—দেখি—দেখি—"

মিথ্যে নয়, চোখের বিভ্রম নয়। ছোট্ট একটি নিটোল মুক্তো। একটি বহুদূরবর্তী তারার মত। উজ্জ্বল। মনোহর।

কয়েক সেকেণ্ড্ সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইল। রূপকথার কাহিনীর মত একি আশ্চর্য ঘটনা !

অস্ফুট কণ্ঠে সবাই উচ্চারণ করল, "মু-ক্তো !"

সেই মুক্তোর দীপ্তিতে সবার চোখে লোভের দীপ্তি ক্ষুরধার ছোরার মত ঝকমক করে উঠল। ঝুপঝাপ সবাই জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আরো ঝিনুক ওঠাল তারা। আরো মুক্তো বেরোল। আরো লোভ, আরো লোভ। তারপরে সন্ধ্যে হল, লোভের অন্ধকার মনের মধ্যে জমাট হল।

নাটকীয় ঘটনা ঘটতে শুরু করল। অতি দ্রুত।

রাতের অন্ধকারে সবাই ভাবতে লাগল। মুক্তো। মুক্তো। মুক্তোর স্বপ্ন দেখতে লাগল সবাই।

চাঁদ উঠল। চন্দ্রালোকে দ্বীপটা রহস্যময় পরীরাজ্যে রূপান্তরিত হল। শেয়ালের পাল দূরে প্রহর ঘোষণা করে নিঃশব্দ হল। সমুদ্র-গর্জনের শব্দে আচ্ছন্ন দ্বীপের বুকে মানুষ-গুলো লোভে ছটফট করতে লাগল।

আবদুল ভাবতে লাগলঃ পুরো দ্বীপটাকে ভোগ করতে হবে। সমস্ত মুক্তোগুলোর মালিক হতে হবে। কিন্তু কি ভাবে? এতগুলো লোকের মাঝে একা কি করে তা সম্ভব হবে! এক হতে পারে, মুসলমান সঙ্গীদের নিয়ে আলাদা একটা দল গড়লে, অর্থাৎ হিন্দুদের বঞ্চিত করলে। হুঁ—তা হয়তো হতে পারে। কিন্তু কিভাবে মুসলমানদের উত্তেজিত করা যায়? কিভাবে?

হরিপদও ভাবতে লাগল। মুক্তো। অনেক মুক্তোর অনেক দাম। কিন্তু মুসলমানদের জন্য অংশ কমে যাচ্ছে। কি করা

যায়? একা সব ভোগ করা যাবেনা, দল বেঁধে ভোগ করতে হবে। সে দলপতি, সুতরাং তার সুবিধে আছে, তার ভাগ বেশী হবে। কিন্তু কি করা যায়? মুসলমানেরাও তাদের বন্ধু—তাদের বিরুদ্ধে সব হিন্দুদের কি করে একজোট করা যায়?

জাহাঙ্গীর আর নকুল ভাবতে লাগল মেয়েটির কথা। নির্জন, অন্ধকার দ্বীপের ওপর ঢলে-পড়া চাঁদের আলো। পেশীতে পেশীতে লালসার উগ্র কামনা। মেয়েটাকে চাই মুক্তো দিয়ে মেয়েটাকে জয় করতে হবে। জাহাঙ্গীর নিকে করবে তাকে। নকুল তাকে মাথার রাণী করবে। আশ্চর্য মেয়েটার চেহারা—অদ্ভুত! সেই আশ্চর্য সুন্দরীর দেহটাকে তারা—

লোভ আর লালসার বিষে দ্বীপের রাত কাঁপতে লাগল।

দিনের বেলা মুসলমানদের আড়ালে নিয়ে গেল আবদুল।

"ভাইসব—বড় বিপদ"—

"বিপদ!" এনায়েৎ প্রশ্ন করল, "সে আবার কি?"

"ভয়ঙ্কর বিপদ"—

সবাই বজ্রকণ্ঠে বলল, "কি বিপদ? কি হয়েছে?"

সাপের মত চোখ মেলে আবদুল বলল, "আমাদের ইসলাম বিপন্ন"—

"কি?"

"কি?"

সবাই শক্ত হয়ে দাঁড়াল, "কেন ? কেন ?"

আবদুল বলল, "হরিপদরা পাখী আর বুলবুলকে জোর করে হিন্দু করতে চাইছে—ইসলাম বিপন্ন"—

"না না"—সবাই এককণ্ঠে মাথা নাড়ল, "তা হতে পারেনা"—

আবদুল কণ্ঠস্বরকে এক ধাপ ওপরে ওঠাল, "ঠিক, তা হতে পারেনা—আমরা তা হতে দেব না—আমরা বাধা দেব। কিন্তু যদি ওরা কথা না শোনে ?"

উত্তেজনায় ফেটে পড়ল সবাই, "তাহলে ওদের শায়েস্তা করতে হবে, তাড়াতে হবে, মেরে নির্মূল করতে হবে"—

"ঠিক, তোমরা সবাই সচ্চা মুসলমান—সত্যি ভাই, ধর্মের চেয়ে আর কিছুই বড় না। ধর্মকে রক্ষা করলে পরিণামে বেহেস্ত্ পাবে তোমরা—শুধু তাই নয়, ইহজন্মেও সেই পূণ্যকর্মের ফল পাবে—মুক্তো ভরা এই দ্বীপকে লাভ করবে"—

সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। ঠিক, আবদুলের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

"ভয় কি ?" আবদুল বলে চলল, "ওরাও পাঁচজন, আমরাও পাঁচজন—একজন মুসলমান পাঁচজন কাফেরের সমান"—

"বিলকুল ঠিক" – জাহাঙ্গীর সায় দিল।

"তাহলে কি করব আমরা ?" গফুর প্রশ্ন করল।

আবদুল জবাব দিল, "বুলবুলকে মুসলমান করব আমরা—আর পাখী তো মুসলমানেরই মেয়ে, তাই না এনায়েৎ ?"

"আলবৎ—আমার আঁখ ঝুটা নয়"—

আবদুল মাথা নাড়ল, "আর যদি বুলবুল রাজী না হয় তাহলে তাকে সাফ করতে কতক্ষণ? পাখীকে না হয় জাহাঙ্গীর নিকে করবে"—

জাহাঙ্গীর খুশীতে দুলে উঠল, "বিলকুল ঠিক আবদুল চাচা—আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব"—

"কিন্তু ওদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কি আছে—তা কি জানো?" নিরীহ কলিম একটু ভীরুকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

আবদুল হাসল, "জানি জানি—আরে ভয় কি? ওদের লাঠি আর দা' আছে—আমাদের আছে ছোরা আর তলোয়ার। ভয় কি? ধর্মকে যে রক্ষা করে তার খোদা সহায়"—

"হ্যাঁ হ্যাঁ—খোদা মালিক"—

ধর্মের জয় হল। চারজনের মাথা একজনের কাছে নত হল।

চারজন হিন্দুর মাথাও সেই সময়ে হরিপদের কাছে নত হল।

কেন হবে না? হরিপদ তাদের সত্যি কথাই বলছিল। বলছিল যে সনাতন হিন্দুধর্ম বিপন্ন। পৃথিবীময়। বাংলাদেশে যা হয়েছে, ভারতবর্ষে যা হয়েছে, এখানে এই ছোট্ট দ্বীপের মধ্যেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। হিন্দু মুসলমান 'ভাই ভাই' ওসব বাজে কথা, তাদের বন্ধুত্ব মিথ্যে, কারণ মুসলমানেরা শুধু সম্প্রদায়গত স্বার্থচিন্তাই করে। সুতরাং তারা কেন নিজের ধর্মের কথা ভাববে না? আবদুলেরা পাখী আর বুলবুলকে জোর করে মুসলমান করার চেষ্টা করছে—তা যদি

হয়, তাহলে তাদের ধর্মের ক্ষতি হবে, স্বার্থেরও হানি ঘটবে। মুসলমানেরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে তাদের দ্বীপ থেকে তাড়াতে পারে, মুক্তো থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

সবাই দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "না—না—তা হবে না" –

হরিপদ মাথা নাড়ল, "নিশ্চয়ই না—মুক্তো কে আবিষ্কার করেছে? নকুল—হিন্দু—সুতরাং সব মুক্তো আমাদের—হিন্দুদের"—

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই"—কার্তিক বলল।

"তাহলে?"

"তাহলে কি?" নকুল প্রশ্ন করল।

"ওদের বাধা দিতে হবে—পাখী আর বুলবুলকে হিন্দু করে দল বাড়াতে হবে—যদি না মানে তো ঈশ্বর সহায়—ভয় কি? লাঠি, দা' আর বর্শা আছে আমাদের কাছে—দরকার হলে লাফিয়ে পড়া যাবে"—

"ঠিক ঠিক—"

সবাই উত্তেজিত হল। সবার চোখে বাঘের চোখকে দেখা গেল। তা দেখে হরিপদ পরমানন্দে হাসল। হ্যাঁ, কার্যসিদ্ধি হয়ে এসেছে।

দুটো লোভী দলের মাঝখানে ওরা দুজনে। দুটো বিরোধী দলের তরঙ্গ এসে ওদের ওপর আছড়ে পড়ে।

দুপুর হতেই আবদুল এসে হাজির হল, বোঝাল।

"আমার কথা শোন বুলবুল, মুসলমান হও"—

"না"—ছেলেটি বিনীতভাবে মাথা নাড়ল।

"ভুল করোনা বুলবুল—পরিণামে স্বর্গ পাবে তুমি"—

ছেলেটি আবার বলল, "না"—

আবদুল ক্রুর হাসি হাসল, বলল, "না বললেও আমি শুনব না, বুঝলে ? এখন আমি যাচ্ছি কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই আবার ফিরে আসব আমি—ইতিমধ্যে ভেবে নাও"—

আবদুল চলে যাওয়ার কয়েকমিনিট বাদেই হরিপদ এসে হাজির হল।

একগাল হেসে সে বলল, "তোমাদের সঙ্গে একটু দেখা করতে এলাম"—

ছেলেটি কথার জবাব দিল না, মেয়েটি ভীরু চোখ মেলে তাকাল।

হরিপদ গলার সুর নামিয়ে বলল, "আবদুলকে যেতে দেখলাম—ও ব্যাটা বুঝি এসে মুসলমান হবার জন্য ফুসলাচ্ছিল ?"

ছেলেটি হাসল, "কোনো ফল হয়নি তাতে"—

হরিপদ খুশী হয়ে বলল, "বেশ বেশ, তা আমি জানতাম। খবরদার, মুসলমান হবে কোন দুঃখে—বুঝলে, তুমি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ কর"—

ছেলেটি ম্লান হাসল, "আমি কোন ধর্মই স্বীকার করি না—মিছিমিছি আর কষ্ট দেবেন না আমাকে"—

"মিছিমিছি !" হরিপদের মোটা শরীর দুলে উঠল, "তোমাকে নরক থেকে উদ্ধার করতে এসেছি"—

"আমাকে নরকেই থাকতে দিন"—

হরিপদ কঠিন হয়ে উঠল, "থাকতে চাইলেই তা দেওয়া যায় না—তোমাদের হিন্দু না করলে আমাদের অমঙ্গল হবে"—

"অমঙ্গল !" ছেলেটি এক পা এগিয়ে এল, "আপনাদের অমঙ্গল দূর করার জন্য আমি প্রাণ দেব"—

"প্রাণ দেবে তবু হিন্দু হতে পারবে না ! ওসব চলবে না—তুমি ভেবে দেখো, আমি একটু বাদেই সবাইকে নিয়ে আসছি"—

হরিপদ চলে গেল।

মেয়েটি কাছে এসে ছেলেটির হাত চেপে ধরল, বলল, "শুনছ গো—ওগো—আমাদের এই সোনার দ্বীপে শয়তান এসেছে"—

একটুবাদেই আবদুল দ্বিতীয়বার এল। সঙ্গে এনায়েৎ ও জাহাঙ্গীর।

"কি বুলবুল—তোমার মত কি ?"

ছেলেটি জবাব দিল, "সেই একই মত—না।"

"ফলাফল খুব ভালো হবে না কিন্তু"—

"না হলেও মত পালটাবে না আমার"—

কঠিনকণ্ঠে সাপের মত হিস্ হিস্ করে উঠল আবদুল, বলল, "এখনো ভালো চাও তো মুসলমান হও বুলবুল"—

"বুলবুল মুসলমান হবেনা"—

আবদুল ও তার সঙ্গীরা ঘুরে তাকাল। দোরগড়ায় হরিপদ। তার পেছনে নকুল ও কার্তিক।

শ্বাপদের হাসি হাসল আবদুল, "কেন হরিপদ? তোমার আপত্তি কেন?"

হরিপদের মুখে কুটিল রেখা ফুটে উঠল, ক্রূর হেসে সে বলল, "কারণ, বুলবুলেরা হিন্দু হবে"—

"বটে! কিন্তু তা হবে না—তুমি জানোনা যে পাখী মুসলমানের মেয়ে"—

"মিথ্যে কথা—তোমাদের বানানো কথা। আমি শুধু জানি যে বুলবুল হিন্দু হবে এবং পাখী তার বৌ"—

আবদুল স্থিরনেত্রে তাকাল, "সাবধান হরিপদ, আমাদের ধর্মে বাধা দিও না"—

"তুমিও আমাদের ধর্মে বাধা দিও না আবদুল"—

"তোমাদের আবার ধর্ম কি হে? যতসব পুতুল খেলা"—আবদুলের ঠোঁট বেঁকে উঠল।

"চোপরও গরুখোর"—

"তবেরে হারামী"—

দুটো যুধ্যমান দলের মাঝে চীৎকার করে লাফিয়ে পড়ল ছেলেটি। মেয়েটি গিয়ে ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে লুকোল,

ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

ছেলেটি বলল, "কি করছেন আপনারা? এসব কি কাণ্ড? আপনারা পাগল হলেন নাকি?"

হরিপদ হাসল, "ভয় পেয়োনা তুমি, শোন, তুমি হিন্দু হও ভাই"—

আবদুল গর্জাল, "তুমি মুসলমান হবে"—

"না"—ছেলেটি চীৎকার করে উঠল, "আমি হিন্দুও হবনা, মুসলমানও হবনা—কেন? আপনারা কেন আমার পেছনে লেগেছেন? যে ধর্ম মানুষকে ভালবাসা থেকে বিমুখ করে, বন্ধুত্বকে বর্জন করতে বলে, আমি সে ধর্ম চাইনা। আপনারা যদি তা না বলতেন, না করতেন, আমি হয়ত একটা কিছু হতাম। কিন্তু আপনাদের জন্যই আমি কিছু হবনা"—

"তুমি নাস্তিক"—

"তুমি কাফের"—

ছেলেটির মুখ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল, সে বলল, আমি ঈশ্বরকে পেয়েছি আমার মধ্যে, আপনাদের মধ্যে—সুতরাং আমি শুধু মানুষই থাকতে চাই"—

"তুমি হিন্দু হবে না"—

"না"—

"না!" হরিপদ গর্জে উঠল, "আচ্ছা, তোমাকে দেখে নেব"—

আবদুল হাসল, "ঠিক বলেছ বুলবুল, তুমি মুসলমান হবে"—

"না"—

"না!"—আবদুল দাঁত দাঁতে ঘষল, "তাহলে এর শোধ নেব"—

হরিপদ আবদুলের দিকে তাকাল, "ওর গায়ে হাত তুললে ভালো হবেনা—বুলবুল হিন্দুর ছেলে"—

"মিথ্যে কথা। তোরাই ওকে হিঁদু বানিয়েছিস—ও আসলে কী তা কেউ জানে না"—

"আরে যা যা"—

"চোপ্ শালা—বক্‌বক্ করিস না"—

"তবেরে হারামীর বাচ্চা"—

আবার দু'দল লাফিয়ে পড়তে চাইল।

"কেটে ফেলব"—কার্তিক চেঁচাল।

"খুন করে ফেলব"—গফুর শাসাল।

কিন্তু হঠাৎ আবদুল থামল, হরিপদও থামল। ক্ষণকাল পরস্পরের দিকে অগ্নিনেত্রে তাকিয়ে থেকে তারা ঘুরে দাঁড়াল।

কার্তিক আর নকুলকে হরিপদ বলল, এখন চল্, পরে দেখা যাবে"—

আবদুল বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ দেখিস্"—

দু'দলই চলে গেল।

ঘরের মধ্যে হিংসার বিষবাষ্প। ওই সব বহিরাগতেরা পরস্পরকে হিংসা করছে, ছেলেটি আর মেয়েটিকেও হিংসা করছে। হিংসুকেরা ভালবাসা সহ্য করতে পারে না।

মেয়েটি কেঁদে ফেলল, ছেলেটির বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"ওগো, আমার ভয় করছে"—

ছেলেটি বলল, "ভয় করোনা—ভয় জীবনের শত্রু"—

"না না, তুমি চল, পালিয়ে চল এখান থেকে"—

ছেলেটির চোখে জল এল, মেয়েটিকে বুকে চেপে ধরে গভীর অনুরাগের সঙ্গে সে তার চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, "যাবো—যাবো পাখী, আজ রাতেই এই দ্বীপকে পরিত্যাগ করব"—

"না, একসঙ্গে থাকব না নেড়েদের সঙ্গে"—হরিপদ বলল।

বাক্স, বিছানা, হাঁড়িবাসন, হুঁকোকলকে, লাঠিসোটা সব নিয়ে বেরিয়ে গেল হরিপদের দল, ঝিলের পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে আড্ডা গাড়ল।

"কিন্তু ঐ কুঁড়ে? আমরা থাকব না—সুতরাং ওরাই বা থাকবে কেন?" কার্তিক বলল।

ঠিক। নারকেল পাতার ছাউনি দেওয়া কুঁড়েটার অর্ধেকটা তারা ভেঙ্গে দিল। সব আধা-আধি।

গফুর ছোরা বের করে বলল, "দেব শালাদের নিকেশ করে?"—

আবদুল বাধা দিল, "এখন নয়। ভাঙ্গুক না ওরা, আবার কাল মেরামত করব। আমরা এখানেই থাকব"—

"তাই বলে ওদের এই জুলুম"—

"মোটেই সহ্য করব না—আজই রাতের বেলা, বুঝলি ?" আবদুল হাসল, তারপর আবার বলল, "কিন্তু একটা কথা, আমাদের নৌকোটা কাছাকাছি এনে রাখ, নইলে বিপদ হতে পারে"—

হরিপদ বিড়ি টানতে টানতে বলল, "শোন্, কাছে আয় সব—"

সবাই জড় হল।

হরিপদ কুটিল চোখ মেলে বলল, "আজ রাতে—বুঝলি ? দু'দিক থেকে রামপেটান দিতে হবে সবাইকে। আর শোন্, আমাদের নৌকোটা নিয়ে এসে এই দিকেই কাছাকাছি বাঁধ্— শালাদের বিশ্বাস নেই।"

কার্তিক বলল, "ঠিক আছে হরিদা'—শালাদের আমি একা ভীমের মত সাবাড় করব। 'গাঁ্যাজা খেয়ে খেয়ে কলিজাকে কড়া করেছি তো যবন-নিপাতের জন্য—" ফ্যাসফেঁসে গলায় সে হেসে উঠল।

হরিপদ নকুলের দিকে তাকাল, বলল, "একটা কাজ পারবি রে ?"

"কি ?"

কি যেন ভাবল হরিপদ, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সিদ্ধান্ত পালটে কার্তিককে বলল, "তুই একটু আড়ালে আয় তো কার্তিক—শোন্—"

হরিপদ আর কার্তিক একটু দূরে গেল।

কি যেন বলল হরিপদ, প্রশ্ন করল, "পারবি ?"

কার্তিক ফ্যাসফেঁসে গলায় আবার হাসল, বলল, "আলবৎ—"

তারক ভীরু মানুষ, সে বিড় বিড় করে বলল, "নাও—কথা নেই বার্তা নেই, অক্তাঅক্তি কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল!—আমি কাঁচকলা—"

নকুল দাঁত বের করে হাসল, "হ্যাঁ, বাবা খরগোস, তুমি কাঁচকলা খাও। দূর শালা, তুই কিরে! তোর গায়ে কি হিন্দুর রক্ত নেই!—"

আবদুল জাহাঙ্গীরের কানে কানে বলল, এই দ্বীপের হুরীকে জান দিয়েছিস তুই, না ?"

"হাঁ চাচা, রাতে আর নিঁদ হয়না শালার—"

"ঠিক আছে, রাত হলেই সেই হুরীকে লুট করে নিয়ে আয় তুই—বুলবুলের ওপর বদ্‌লা নিই—ব্যস্, ওর থেকেই লেগে যাবে—"

জাহাঙ্গীরের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তার চোখের তারায় বন্য উল্লাস ও লালসা বিদ্যুতের মত ঝিকিয়ে উঠল।

"পারবি তো ?"

"আলবৎ চাচা, আমি ছাড়া এ কাজ আর কে পারবে ?—"

"বেশ" সবার দিকে তাকিয়ে আবদুল বলল, "এবার খাড়ির দিকে চল্ সবাই, আজকের দিনটা ওরা জন্মের মত মুক্তো তুলে নিক—কিচ্ছুটি বলিস্ না—"

এনায়েৎ জিভ্ কাটল, "তঁওবা, তঁওবা, তাঁ কঁরব কেঁন? নাঁ নাঁ। শুঁধু জঁলটা ঘেঁালা কঁরে দেঁব এঁট্টু—এঁ্যা? হাঃ হাঃ হাঃ—"

কুৎসিত হাসিতে কেটে পড়ল এনায়েৎ।

সন্ধ্যে হয়ে এল।

হরিপদ তার দলকে জিজ্ঞেস করল, "সব ঠিক?"

সবাই জবাব দিল "হ্যাঁ।"

শুধু কার্তিক জবাব দিল না। সে তখন গাঁজা টান্ছে।

"রাত হবার একটু পরে—আমি বলব—" হরিপদ বলল।

"আচ্ছা।"

বিরোধীরাও তখন তৈরি হয়েছে। তারাও রাত হবার একটু পরেই আক্রমণ করবে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। শুধু বীরেরা বেঁচে থাকবে, ভোগ করবে। আর, বীর কে? যে কুটিল, যে হিংসাপরায়ণ, যে লোভী, যে লম্পট, যে পশু।

সন্ধ্যে হয়ে এল। আজ বিকেল থেকেই হাওয়া পড়ে গিয়েছিল, তাই দ্বীপ নিঃশব্দ। নারিকেল, সুপারী, ঝাউ আর সুন্দরীরা সব শান্ত, স্তব্ধ। তাদের নিষ্কম্প পাতাগুলো যেন তুলি দিয়ে আঁকা। দূর থেকে হরিণের ডাক ভেসে আসে, কিন্তু দেখা

যায় না তাদের। শোনা যায় ঘুঘুর উদাস ডাক। আর সমুদ্রের গর্জন। একটানা, বিরামহীন। ওপরের মহাকাশে সোনার আবীর ছড়ানো। সূর্য নেই।

ছেলেটি বলল, "আজই যাব পাখী—আজই—"

মেয়েটির মুখে আলোর ঝিলিক খেলে গেল, "হ্যাঁ, তাই চল, তাই চল—"

ছেলেটি বলল, "তাহলে আমি একবার দেখে আসি – "

মেয়েটি সভয়ে প্রশ্ন করল, "কোথায় যাবে? কি দেখবে?"

"দেখে আসি শয়তানেরা কারা কোন দিকে আছে—তা নইলে পালাতে গিয়ে হয়তো ধরা পড়ে যাব—"

মেয়েটি কম্পিতকণ্ঠে বলল, "দেরি করো না তা হলে, কেমন?"

"না—"

ছেলেটি মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি আজকাল আরো সুন্দরী হয়েছে, আশ্চর্য একটা পরিপক্ক লাবণ্যের জোয়ার নেমেছে তার ত্বকে, তার প্রতিটি রোমকূপে। রসালো ঠোঁট, ডাগর দুটি চোখ, মধুময় বক্ষপদ্ম, আবেগে উন্মত্ত দুটি বাহু। তার নারী। তার দ্বীপ।

ধীরে ধীরে মেয়েটিকে বুকে টেনে নিল সে, প্রশ্ন করল, "পাখী!"

„উঁ?”

“তোমার কি লোভ হয় ঐ রকম হিন্দু বা মুসলমান হতে?”

“না, লোভ কেন হবে?” মেয়েটি হাসল, “আমি মানুষ হয়েছি—আমি এখন মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান—স-ব। কারণ সব ধর্মই মানুষকে মানুষ হতে বলে। আর সত্যিকারের মানুষের মধ্যে সমস্ত ধর্মই বিকশিত হয়।”

দু'হাতে মেয়েটির মুখ তুলে ধরল ছেলেটি, কুঁড়ে ঘরের ছোট্ট মোমবাতির আলোকে তার মুখখানি দেখল। পৃথিবীর সমস্ত মাধুর্য যেন জড় হয়ে আছে মুখটিতে। মুগ্ধ আবেশে চোখ দুটি তার অর্ধ-নীমিলিত।

মেয়েটিকে একটি চুমু খেয়ে ছেলেটি অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল।

পেছন থেকে সকরুণ আবেদন জানাল মেয়েটি, “তাড়াতাড়ি ফিরে এসো গো—তাড়াতাড়ি এসো—”

ভাবতে ভাবতে এগোল ছেলেটি।

দূরে শেয়াল ডেকে উঠল। ঝিঁ ঝিঁ পোকারা মুহূর্তের জন্য সেই ডাকে স্তব্ধ হয়ে আবার ডাকতে শুরু করল। শুক্‌নো পাতা খচমচ করে উঠল পায়ের নীচে। নিঃশব্দ দ্বীপ। বাতাস নেই। কিন্তু কোথায়? আজ না নবমী? চাঁদ কোথায়? ছেলেটি তাকাল। আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে। কান পাতল

সে। সমুদ্রের গর্জন যেন আজ একটু গম্ভীর। কেন? ঝড় উঠবে নাকি? ভয় হল ছেলেটির। সেদিনের মত ঝড়। না, না। আজ, অন্ততঃ আজ যেন ঝড় না ওঠে। হে ঈশ্বর, হে দ্বীপের দেবতা, আজ যেন ঝড় না ওঠে।

এগোল সে। মিছিমিছি ভয় পাচ্ছে সে। কিচ্ছু হবে না আজ।

কিন্তু সে কি আজ যাবেই? দ্বীপটা যেন কথা বলছে, যেতে নিষেধ করছে। দূর, ও তার বিক্ষুব্ধ মস্তিষ্কের ইন্দ্রজাল। এগোল সে।

দূর থেকে সে দেখল হিন্দুদের আড্ডা। চুপচাপ বসে আছে তারা।

আরো এগোল সে।

ঝিলের আর একদিকে গিয়ে সে মুসলমানদের দেখল দূর থেকে। ওরাও নিঃশব্দ। তুটো যুদ্ধকামী শত্রু-শিবির ঘৃণা ও হিংসায় রুদ্ধবাক হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

ফিরে চলল সে। ঠিক আছে। তারা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না, কোন তুর্বলতাকে সে মনে স্থান দেবে না। সে আজ এই দ্বীপকে পরিত্যাগ করবেই।

কুঁড়ে ঘরটা কাছে এল।

হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ কাণে এল তার। কি ব্যাপার! কে আর্তনাদ করল! কোনো পুরুষ! কোনো নারী! পাখী! ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ছেলেটি, প্রাণপণে দৌড়োল। হঠাৎ

কান খাড়া করে থামল সে। কে যেন চলে যাচ্ছে! শুকনো পাতা চুরমার করে কে যেন ছুটে যাচ্ছে!

"কে?" ছেলেটি চেঁচাল।

কোন সাড়া এল না। ছেলেটি আর অপেক্ষা না করে আবার কুঁড়ে ঘরের দিকে দৌড়োল।

ঝাঁপিটা খোলা। ঢুকতে গিয়ে পায়ের সামনে একটা শোণিতসিক্ত দেহ দেখে সে চমকে থামল। কার্তিক পড়ে আছে। তাঁর বুকে একটা ছোরা আমূল বিঁধে আছে। তার পাশে আর একটি রক্তাক্ত ছোরা পড়ে আছে।

ছেলেটি কেঁপে উঠল, ভয় পেয়ে ডাকল, "পাখী—পাখী—"

একটা গোঙানীর শব্দ ভেতর থেকে ছিটকে এল।

ছেলেটি ছুটে ভেতরে গেল, ভেতরে গিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ে সে আর্তনাদ করে উঠল—

"পাখী!"

মেয়েটিও মাটির ওপর পড়ে আছে—তার পিঠের ওপর ছোরার আঘাত। রক্তে তার দেহ, চুল আর মাটি ভিজে উঠেছে।

চোখের সামনে মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে এল সব। মুহূর্তমাত্র। সেই পুঞ্জপুঞ্জ গাঢ় অন্ধকার থেকে জোর করে নিজেকে টেনে তুলল ছেলেটি, মেয়েটির মাথা কোলের ওপর তুলে নিয়ে ডাকল, "পাখী—পাখী—"

"উঁ?"

"আমি এসেছি পাখী—"

মেয়েটি চোখ মেলে তাকাল, হাসল, ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "এসেছ! তা হলে আর ভয় কি? এবার চল—এখানে থাকলে যে মরে যাবে—"

ছেলেটির দুচোখ জ্বালা করতে লাগল, দাঁত দিয়ে নিষ্ফল ক্রন্দনাবেগকে যেন কুচি কুচি করে কাটল সে, বলল, "হ্যাঁ, এবার যাব, এখন সব তৈরী—"

মেয়েটির ক্ষতস্থানকে সেই সঞ্চিত ছেঁড়া কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধল সে, তাকে একটু জল খাওয়াল, তারপরে তাকে কাঁধে ফেলে ভাঙা তলোয়ারটা হাতে নিয়ে সে কুঁড়ে থেকে বেরোল।

চলতে চলতে ডাকল সে, "পাখী—কোন্ শত্রু এমন করল?"

"বলছি—"

দ্বীপ নিঃশব্দ। হঠাৎ দূরে যেন বাতাসের গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল। অনেক দূরে।

মেয়েটি ক্ষীণকণ্ঠে বলল সব কথা:

ছেলেটি কুঁড়ে থেকে বেরোবার কয়েক মিনিট বাদেই কার্তিক এসেছিল।

মেয়েটি তাকে দেখে ভয় পেয়েছিল, প্রশ্ন করেছিল, "কি চাই আপনার?"

ফ্যাসফেঁসে গলায় কার্তিক হেসেছিল, "চাই তোমার মরদ-কে—কোথায় সে?"

"সে নেই—বাইরে গেছে—"

"বাইরে! হুঁ—তাহলে বসি একটু—"

"এখন যান—পরে আসবেন—"

"হেঃ হেঃ হেঃ—আমি তো কোন ক্ষতি করছি না গো—একটু বসিই না—"

বসে বসে কার্তিক মেয়েটিকে দেখছিল। মাথার মধ্যে তার গাঁজার গাঢ় নেশা, চোখের সামনে পাৎলা মেঘের আস্তরণ। সেই মেঘের ভেতর দিয়ে মেয়েটিকে যেন কোন ইন্দ্রিয়াতীত লোকের রূপসী বলে মনে হয়েছিল। সাপের মত একাগ্রদৃষ্টি মেলে দেখছিল সে। দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কার্তিক, ফিস্‌ফিস করে বলেছিল, "দেখতে ভারী সুন্দর তুই—মাইরি—"

মেয়েটির চোখে ত্রাস ঘনিয়েছিল, সে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই কার্তিক তার হাত চেপে ধরেছিল, আকর্ষণ করে নিজের কাছে নিয়ে এসে বলেছিল, "হেঁ হেঁ—পালাচ্ছিস্ কেন ভাই—শোন্—"

"খবরদার—"

কার্তিক ঘুরে তাকিয়েছিল।

দোরগড়ায় জাহাঙ্গীর, নেশার ঘোরে তার পা টলছে, চোখ জ্বলছে।

পরমুহূর্তেই কার্তিকের ওপর লাফিয়ে পড়েছিল জাহাঙ্গীর। বর্বর যুগের বন্য জন্তুদের লড়াই শুরু হয়েছিল তারপর। সেই

লড়াইয়ে কার্তিক মারা গেল। মেয়েটি পালাবার কোন পথই পাচ্ছিল না।

কার্তিকের দেহটাকে লাথি মেরে দূরে ফেলে জাহাঙ্গীর টলতে টলতে তার দিকে এগিয়ে আসছিল, তার চোখে লোলুপ দৃষ্টি, মুখে লালসাতুর হাসি।

"খবরদার, আগে এসো না—"

"তুই আমার পাখী—আমি তোকে নিকে করব—"

"সাবধান শয়তাণ, এগোলে ভালো হবে না—"

"দূর পাগ্‌লী—রাগিস্‌ কেন—" এক পা এক পা করে এগোচ্ছিল জাহাঙ্গীর।

না, প্রাণ দেবে তবু ইজ্জৎ দেবে না সে। মেয়েটি অনন্যোপায় হয়ে ছুটে গিয়েছিল এক কোণে, চালায় গোঁজা বর্শাফলকটাকে তুলে নিয়েছিল হাতে।

"খবরদার—আমার দিকে এগিয়ো না—"

"হাঃ হাঃ হাঃ—রাগিস্‌ না পাগ্‌লী আমার—"

বর্শাটাকে তাক করে তখন ছুঁড়েছিল মেয়েটি। একটা বিকট আর্তনাদ করে জাহাঙ্গীর মাটিতে বসে পড়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েটি পালাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিল তখন।

জাহাঙ্গীর তখন আহত জানোয়ারের মত গর্জেছিল, "তুই পার পাবি ভেবেছিস? না—"

কার্তিকের বুক থেকে ছোরা টেনে তুলে সে তা মেয়েটির

দিকে তখন ছুঁড়ে মেরেছিল। মেয়েটির পিঠে লেগেছিল তা, সে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল।

বর্শার আঘাতে আহত জাহাঙ্গীর মেয়েটির দিকে তখন পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু রক্তমোক্ষণ হচ্ছিল তার, তার মুখে চোখে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছিল। হঠাৎ দূর থেকে শুক্‌নো পাতার খচ্‌মচ্‌ শব্দ তার কাণে আসতেই সে টলতে টলতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল ঃ

মেয়েটি থামল।

ছেলেটি বুঝতে পারল। একটু আগে সে জঙ্গলে যার পদ-শব্দ শুনেছিল সে আর কেউ নয়, জাহাঙ্গীর। ছেলেটির রক্ত টগবগ করে উঠল। প্রতিশোধ? না। উপায় নেই। তার নারী আহত। এগিয়ে চলল সে।

হঠাৎ সেই পূর্বশ্রুত গোঁ গোঁ শব্দ এবার প্রবল হয়ে উঠল। সমুদ্রের ডাক যেন শেকলে বাঁধা লক্ষ লক্ষ দৈত্যের গর্জনের মত প্রবল হয়ে উঠল। দ্বীপের গাছপালা সে শব্দে দুলতে আরম্ভ করল। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মেঘের গম্ভীর ডাক গড়িয়ে যেতে লাগল। দ্বীপটা যেন কেঁপে উঠল। ছেলেটি বুঝল যে ঝড় এল। ঈশ্বর তার কথা শোনেননি। দ্বীপের দেবতা তার প্রার্থনাকে আমল দেননি।

হঠাৎ পেছন থেকে, সেই সব শব্দ ভেদ করে একটা হিংস্র কোলাহল ভেসে এল।

"আল্লা-হো আকবর—"

"কা-লী মা-ঈ-কী জয়—"

ছেলেটি বুঝল। দাঙ্গা হচ্ছে। প্রকৃতির রুদ্র মূর্তির মধ্যেই মানুষের হিংস্র মূর্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ধর্মের নাম করে স্বার্থের জন্য হানাহানি করছে মূর্খেরা।

"ওকি! ওগো, ও কিসের শব্দ?"

"শয়তানেরা আত্মহত্যা করছে পাখী—"

"চল চল—পালিয়ে চল—"

"তোমার কি কষ্ট হচ্ছে খুব?"

"ভয় পেয়ো না—আমি মরব না। কেন মরব আমি? ভালবেসে আমার যে সাধ মেটেনি—"

ছেলেটির চোখ জ্বালা করে। কী আশ্চর্য! চোখে জল আসে না কেন? ছুটে এগোল সে। হ্যাঁ, পালাও, পালাও। হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবী থেকে, হিংসুক মানুষদের সমাজ থেকে। দূরে পালাও, দূরে—দূরে—

"ওগো—আর কতদূর?"

"এসে গেছি—টিলা পার হচ্ছি আমরা—"

পেছন থেকে সমুদ্রের পাহাড় ফাটানো ডাক আসছে। হয়ত আজো সেদিনের মত সমুদ্র এসে দ্বীপের বুকে আছড়ে পড়বে। আসুক। রসাতলে যাক সব কিছু। সে আজ ফিরবে না। সে আজ যাবেই। এই হিংসার জগৎকে সে আজ পরিত্যাগ করবেই।

"ওগো—"

"কি ?"

"দ্বীপটা বড় সুন্দর—"

"হ্যাঁ—"

"আমাদের ধানের চারাগুলো হয়ত আরো কিছুদিন পরেই পাকবে, তাই না ? উঃ—"

"চুপ করো, তুমি চুপ করো—"

বালুতটের দিকে, টিলার নিম্নাংশে ছেলেটি মেয়েটিকে শোয়ালো। ঝড় এসে দ্বীপকে ধরে তখন খেলনার মত নাড়া দিচ্ছে, সমুদ্র ওদিকে দ্বীপের দেহ লেহন করছে। গাছপালা মড়মড় শব্দে ভেঙে উপড়ে পড়ছে, মোহানার জল ফুলে ফেঁপে সমুদ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আট-দশ হাত উঁচু দেয়ালের মত ঢেউ এসে তটভূমির ওপর ভেঙে পড়ছে।

কিন্তু কোথায় ? নৌকো কোথায় ? নৌকো ? নৌকো ? পাগলের মত এদিক ওদিক ছুটোছুটি করল সে। কিন্তু নেই। একটিও নৌকো নেই। হয় উন্মত্ত জলরাশি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, নয় শয়তানেরা তা সরিয়ে নিয়ে গেছে। এবার ?

পরাজিত ভঙ্গীতে সে মেয়েটির কাছে ফিরে গেল।

চারদিকে দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকার। বহুদূরে বাড়বানল-দীপ্তি। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো। সেই আলোতে আবার যেন শুভদৃষ্টি হল দুজনের।

মেয়েটির গলা এবার শোনা যায় না, তার ক্ষত দিয়ে আবার রক্তমোক্ষণ হচ্ছে।

"ওগো"—

"কি ?"

"না গেলে—"

"কেন ?"

"দ্বীপটা সুন্দর—বড় সুন্দর"

"হ্যাঁ—"

"আমাদের দ্বীপ—"

"হ্যাঁ—"

"হরিণের পাল—পাকা ধানের শীষ—"

ছেলেটির বুক ফেটে যেতে চাইল।

মেয়েটি বিকৃত, অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, "তিল তিল করে যে দ্বীপকে আমরা প্রাণবন্ত করেছি তা নষ্ট হবে! তাকে—ছেড়ে—পালাব ?—"

"তুমি কথা বলো না—"

"ওগো—"

"কি ?"

"তুমি কোথায় ?"

"এই যে—"

"যেয়ো না—এ দ্বীপ ছেড়ে—যেয়ো না—"

"না, যাবো না—কিন্তু তুমি চুপ করো, চুপ করো—"

মেয়েটি হঠাৎ দু'হাত শূন্যে তুলে দিল, কাকে যেন খুঁজল,

ভাঙা ভাঙা গলায় সে বলল, "আমাকে ফেলে কোথায় গেলে? কোথায়? কে! ওঃ, দুষ্টু ছেলে! ওগো—ওগো—"

হঠাৎ থেমে গেল মেয়েটি। ছেলেটি মেয়েটির মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "হ্যাঁ, কি বলছ? চুপ করো লক্ষ্মীটি—চুপ্—"

কিন্তু এ কি! এ কি! এ কি!—সব শেষ! পাখী আর নেই!

আকাশটা কাঁপছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে। ওপরের পৃথিবী ভাঙছে। মোহানার জলে সমুদ্রের ক্রোধ। ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্র। গাছ-পালা ভেঙে পড়ছে। দ্বীপটা যেন দুলছে। মাথা ঘুরছে, বুক ফেটে যেতে চাইছে, চোখের সামনে অন্ধকার আবর্তিত হচ্ছে।

সত্যি তো, কোথায় পালাবে সে? এই দ্বীপ তার। কেন সে এই দ্বীপ ছেড়ে যাবে? অন্য দ্বীপ, উপদ্বীপ, দেশ, মহাদেশ—পৃথিবীময় সর্বত্র এই একই দ্বীপের ইতিহাস। মানুষের মনেও এই দ্বীপের কাহিনী। স্বার্থ, হিংসা, লোভ, লালসা। একই ইতিহাস। সব ইতিহাসের মূলে একই ইতিহাস—বৈষম্য। শ্রেণীগত, জাতিগত, বর্ণগত। সাদা কালো, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, বিদ্বান ও মূর্খ। বৈষম্য কেউ চায় না। অথচ সুবিধাবাদীদের জন্য বৈষম্য দূরও হয় না। শক্তিমানেরা ভোগের স্বাদ পেয়ে বৈষম্যকে জিইয়ে রাখে। ধর্মের নামে, নীতির নামে, ঈশ্বরের নামে, অদৃষ্ট ও পূর্বজন্মের নামে। তাই ন্যায়ের নামে অন্যায়, নীতির নামে চৌর্য ও লাম্পট্য, প্রেমের নামে ঘৃণা।

তাই ধর্মের আবরণে হিংসাবৃত্তিকেই চরিতার্থ করে মানুষ, তাই ধর্মকে করে স্বার্থের বাহন।

কোথায় যাবে সে? একই ইতিহাস। দুর্দিনেও পথ পায়নি মানুষ, বৈষম্যজনিত পাপের বিষফল খেয়ে তারা হিংসায় উন্মত্ত হয়েছে, পরস্পরের বুকের রক্ত পান করেছে, আত্মঘাতী মারণযজ্ঞে নিজেদের নিশ্চিহ্ন করেছে। এই দ্বীপের ভাঙা অট্টালিকাস্তূপেও সেই চিহ্ন। পৃথিবীময় মাটির বুকে শুধু হাড়ের ইতিহাস।

কোথায় পালাবে কাপুরুষ? সত্যকে উপলব্ধি করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, কর্তব্য পালন করো, উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করো, নির্ভয়ে সংগ্রাম কর। না করলে সব হারাবে তুমি। তোমার দ্বীপ, তোমার নারী, তোমার ঐশ্বর্য ও মর্য্যাদা। জাগো, নিজের নিজের দ্বীপের পাপকে সবাই ধ্বংস করো, চিরকালের ইতিহাসকে বদলাও।

•

ছেলেটির শরীর যেন লোহার মত শক্ত হয়ে উঠল। তার হৃদয়ে ঘৃণা। পাপের বিরুদ্ধে, লোভের বিরুদ্ধে। সে উঠে দাঁড়াল, মেয়েটিকে সে সযত্নে কাঁধের ওপর তুলল। সেই আশ্চর্য, সুকোমল দেহ এখন নিস্পন্দ। সেই মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর এখন মূক! সেই দেবী এখন অন্তর্হিতা। হিংসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তার পাখী। আর কেন হিংসা! ধর্ম? মোটেই না। সে জানে না কি সেই কারণ কিন্তু এটা সে নিশ্চিত জানে যে এই ধর্মান্ধতার অন্তরালে আছে স্বার্থ আর লোভ।

টিলার ওপরে আবার উঠতে লাগল সে। হ্যাঁ; সে পালাবে না, সে থাকবে, এই দ্বীপেই থাকবে। এই দ্বীপই তার পৃথিবী আর পৃ[illegible] তো এই দ্বীপের মত।

[illegible], তার জীবন থেকে যারা পাখীকে, তার [illegible] ছিনিয়ে নিল তাদের সঙ্গে সে সংগ্রাম করবে, তাদের সে প[illegible] তার দ্বীপ থেকে হিংসাকে দূর করে সে পাখীর মৃত্যু [illegible] বে। না, শোক করবে না সে, সময় নেই।

দ্বীপের দক্ষিণে [illegible] ংকর ডাক। হয়ত সমুদ্রের ভেতর থেকে সোদনক[illegible] দৈত্যটা আজো মাথা চাড়া দিয়ে দ্বীপের বুকে ছু[illegible] তার ভয় নেই।

সামনের দিকে তাকাল সে। অন্ধকারে [illegible] দ্বীপটা। মানুষের হিংসা ও লোভে তা যেন আজ আরো অন্ধকার হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দুরন্ত ঘৃণায় ছেলেটি ফেটে পড়ল, সমস্ত অন্তর মথিত করে সে পাগলের মত চীৎকার করে বলল, "ঈশ্বর—তোমার পৃথিবীতে কি শুধু হিন্দু আর মুসলমানের রাজ্যই আছে, মানুষের রাজ্য নেই?"

অন্ধকারে, উন্মত্ত ঝড়ো হাওয়াতে তার সেই চীৎকার মিলিয়ে গেল। সে এগোল, তার বুকে শপথ ধ্বনিত হল। আমি সংগ্রাম করব, আমি মানুষের রাজ্যকে এই দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করব। হাতের ভাঙা তলোয়ারটাকে হঠাৎ সে দূরে ফেলে দিল। ওটা

অর্থহীন। আমার অস্ত্র সত্য। সত্য বজ্রের চেয়েও ভয়ংকর। মানুষ অস্ত্রকে গ্রাহ্য করে না কিন্তু সত্যকে সে ভয় পায়।

ঝড়ের দোলায় দ্বীপটা থরথর করে কেঁপে উঠল। যেন ভূমিকম্প হল। তবু থামল না ছেলেটি, ভয় পেল না, মনে মনে সে বলল, "ঝড় নয়, ভূমিকম্প নয়, আমার পদক্ষেপেই দ্বীপটা কাঁপছে, কারণ আমার সঙ্গে সত্য আছে।"

সে এগিয়ে চলল। (সতীদেহ-বহনকারী প্রমত্ত শিবের মত।)
